প্রগতি

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

ও

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদিত

প্রগতি লেখক সঙ্ঘ

কলিকাতা

১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বরণীয়েষু—

আমি যে দেখিনু গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে

হেনেছে নিঃসহায়ে,

আমি যে দেখিনু প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে,

আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছোটে,

কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশী সঙ্গীতহারা,

অমাবস্যার কারা

লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,

তাইতো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে,

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,

তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ,

তুমি কি বেসেছ ভালো ?

—রবীন্দ্রনাথ

মুখবন্ধ

প্রগতি লেখক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে আমরা এই সঙ্কলনের ভার নিয়েছিলাম। যাঁদের লেখা এতে আছে, তাঁরা প্রায় সকলেই সঙ্ঘের সভ্য; কয়েকজন সভ্য না হলেও সঙ্ঘের উদ্দেশ্যের সঙ্গে একমত। আমরা শুধু বলতে পারি যে যাঁরা এতে লিখিছেন, তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে সামাজিক চৈতন্য সাহিত্য সৃষ্টির পরিপন্থী, তাঁরা মনে করেন যে কোন লেখকই সমাজ সমস্যা সম্বন্ধে নির্ব্বিকার হতে পারেন না। রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে তাঁদের পরস্পর মতভেদ আছে বটে, কিন্তু তাঁরা সকলেই ফ্যাশিজ্‌মের বিরোধী, ফ্যাশিজ্‌ম্ সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছে, প্রগতির পথ রুদ্ধ করছে, গণশক্তিকে খর্ব্ব করছে বলে।

ভবিষ্যতে এরূপ সঙ্কলন প্রকাশের ইচ্ছা আমাদের আছে। সঙ্ঘের আর্থিক অস্বাচ্ছল্যের জন্য আমরা এবার কোন লেখককেই পারিশ্রমিক দিতে পারিনি। অর্থের দিক থেকে আমাদের এই চেষ্টা সফল হলে আগামী বারে লেখকদের যথাযথ পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে আশা করি। একথা আমরা বলছি এই কারণে যে আমাদের দেশে লেখকরা সাধারণত আর্থিক দুশ্চিন্তা

থেকে সহজে অব্যাহতি পান না, আর সেইজন্য আমাদের সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতিই হয়ে থাকে। প্রগতি লেখক সঙ্ঘের একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে লেখকদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ; তাই এবার আমরা তাঁদের ঔদার্য্যের সুযোগ নিতে বাধ্য হয়েছি বলে দুঃখিত।

শ্রীমতী ষ্টেলা সেনগুপ্ত এ বইয়ের প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা করে দিয়ে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। কয়েকটী অনিবার্য্য কারণে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের লেখা প্রকাশ করা সম্ভব হল না বলে আমরা বিশেষ দুঃখিত। যাঁদের লেখা পেয়ে আমরা অনুগৃহীত হয়েছি, তাঁদের প্রত্যেককে সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর এই সংগ্রহে কয়েকটী লেখার পুনর্মুদ্রনের জন্য গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কাত্যায়ণী বুক ষ্টল, গুপ্ত ফ্রেণ্ড্‌স্ এণ্ড কোং, কবিতা ভবন, ভারতী ভবন, "ছন্দা", "নূতন পত্রিকা" "আনন্দবাজার পত্রিকা" ও "পরিচয়ের" কর্ত্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সূচীপত্র

ভূমিকা

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রগতি লেখক-সঙ্ঘের এই প্রথম বইখানি প্রকাশিত হইল। এই সঙ্ঘের সম্বন্ধে অনেকের একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে। সেটা সাধারণতঃ সঙ্ঘের অনুকুল নয় এবং সম্পূর্ণ সত্যও নয়। হয়তো এই সংগ্রহগ্রন্থ হইতে সে ধারণা কতকটা সংশোধিত হইবে। সঙ্ঘ কি চায়, ইহার মূলসূত্র কি, তার পরিপূর্ণ ধারণা ইহাতে পাওয়া যাইবে না, কিন্তু একটা আভাস পাওয়া যাইবে।

প্রগতি-লেখক-সঙ্ঘ সাহিত্য ও সমাজে প্রগতিকামী—সে অভীপ্সিত প্রগতি সাধনের পক্ষে সঙ্ঘের উপায় সাহিত্য। যে সাহিত্যের পুষ্টি ও সমৃদ্ধি সঙ্ঘ কামনা করেন তাহা সমাজের প্রগতির অনুকূল হইবে—কিন্তু তাহা সাহিত্য হওয়া চাই—সাহিত্যরসভূয়িষ্ঠ হওয়া চাই।

সার্থক সাহিত্য প্রগতিশীল হইতে বাধ্য। প্রগতি ছাড়া সাহিত্যই হয় না। যাহা গতানুগতিক, যাহা কেবলমাত্র পুরাতনের বিজৃম্ভন, তাহাতে কাব্য-কুশলতা যতই থাকুক তাহা সাহিত্য বলিয়া স্থায়ী প্রতিষ্ঠা কোনও দিনই

পায় না। গতানুগতিকের বাঁধা খাত ছাড়িয়া যিনি কোনও নূতন পথ—রসের নূতন ধারা আবিষ্কার করিতে পারেন তাঁরই সাহিত্য রচনা সার্থক হয়।

কোনও এক লোকোত্তর প্রতিভাশালী লেখক একটি নূতন পন্থা অনুসরণ করিয়া সাহিত্য রচনায় সার্থকতা লাভ করিলে সঙ্গে সঙ্গে বহুতর ব্যক্তি তাঁর সে পথ ধরিয়া তাঁরই অনুকরণে সাহিত্য রচনা করে। তার মধ্যে যাহা শুধু অনুকরণ, যার ভিতর নিজস্ব নূতন কিছু নাই, তাহা মুহূর্ত্তে বিলুপ্ত হইয়া যায়, নূতন যাহা, যার ভিতর রসবস্তুর নূতন কোনও বিকাশ থাকে, তাহাই চিরকাল স্থায়ী হইয়া থাকে।

রস-সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলেও আমরা দেখিতে পাই, যে সে সাহিত্যের প্রগতিশীল না হইয়া উপায় নাই। কেননা সে সাহিত্যের উপজীব্য মানব-জীবন, সমাজ-জীবন। ম্যাথু আর্ণল্ড জীবন-জিজ্ঞাসা (criticism of life) বলিয়া কবিতার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সকল এপিগ্রামের মত তাঁর এই সূত্রাকার উক্তিটিও সম্পূর্ণ সত্য নয়, আংশিক সত্য মাত্র—কিন্তু ইহার ভিতর একটা খাঁটি সত্যের প্রকাশ আছে। কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে একথা আরও নিশ্চয়তার সহিত বলা যায়—কেননা কথা-সাহিত্য মানব-জীবন লইয়াই লেখা। জীবনের একটা রসরূপ প্রকাশই কথা-সাহিত্যের লক্ষ্য।

মানব-জীবন এমন বিচিত্র, এমন জটিল, তার ভিতর রসের এত অফুরন্ত উপাদান অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছড়ান আছে যে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া লোকে সে রসের পরিচয় দিয়া তার রস সমৃদ্ধি নিঃশেষ করিতে পারে নাই, কোনও দিন পারিবে না।

এই মানব-জীবন, সমাজ-জীবন, ইহা স্থাণু নয় চঞ্চল। যাহা অতীত, তার মধ্যে যাহা চিরন্তন, তাহা লুপ্ত হয় নাই, কিন্তু সেই অতীতের অভিজ্ঞতা, নিত্য সমৃদ্ধ ও রূপান্তরিত হইয়া উঠিতেছে প্রতিমুহূর্ত্তের নব সৃষ্টিতে, প্রতিদিন মানব-সমাজ নবজন্ম লাভ করিতেছে। তার অনুভূতি, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার দৃষ্টিক্ষেত্র নিয়ত রূপান্তরিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যুগে যুগে সাহিত্য সেই রূপান্তরিত-জীবনের নূতন রসমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সার্থক হইতেছে।

চলিষ্ণু সমাজ ও মানব চিত্তের এই প্রগতির সঙ্গে তাল রাখিয়া যে সাহিত্যিক রস-রচনা করেন তিনিই সার্থকতা লাভ করেন। সমাজের নবজীবনের নূতন বার্ত্তা যে না জানে, নবযুগের নূতন প্রাণের পরিচয় যে দিব্য চক্ষে না দেখিতে পারে, শুধু অতীত কৃতীদের রচনার মুখে জীবনের স্বাদ গ্রহণ করিয়া যে সাহিত্য রচনা করিতে যায় তার রচনা হয় অসার্থক।

সেক্সপীয়ার পড়িয়া, কালিদাস পড়িয়া, ইউরিপ্রিডিস পড়িয়া আমরা তৃপ্তি পাই—চণ্ডীদাসের পদাবলীতে অপূর্ব্ব

আনন্দ লাভ করি। কেননা এই সব মহামনীষির মধ্যে কেউ গতানুগতিক ছিলেন না—জীবনের পরিচয় তাঁরা পরের মুখে ঝাল খাইয়া পান নাই। প্রত্যেকে তাঁর নিজের যুগের সমাজ ও মানব জীবন সাক্ষাৎদৃষ্টিতে দেখিয়া তার রসমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু আজ যদি কোনও সাহিত্যিক ঠিক সেক্সপীয়ারের শ্রেষ্ঠ একখানি নাটকের মত একখানি নাটক লেখেন, কিম্বা চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ একটি পদের অনুকরণ করেন তবে তাঁর অনুকৃতির কৌশলের লোকে যতই তারিফ করুক, তাঁর লেখা সাহিত্যপদবাচ্য হইবে না। কেননা আজকের যে সাহিত্য তাহা সার্থক হইতে হইলে আজকের দিনে মানব-জীবনের সাক্ষাৎ অনুভূতির উপর তাকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। মানব জীবনের যে রসমূর্ত্তি আজকের অভিজ্ঞতায় আমরা লাভ করিতে পারি তার পরিচয় যে সাহিত্যে না পাই তাহা সাহিত্য নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র তার লোকাতীত প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন যে সাহিত্যে তাহা রসিকসমাজ চিরদিন মাথায় করিয়া রাখিবে। কিন্তু যে সাহিত্যিক আজ উপন্যাস লিখিতে বসিয়া গোবিন্দলাল বা নগেন্দ্রনাথ, কুন্দ-নন্দিনী বা ভ্রমরের মনের ক্ষেত্রের বাহিরে পদক্ষেপ করিতে পারেন না তাঁর উপন্যাস লিখিয়া সার্থকতা লাভের আশা বিড়ম্বনা। কেননা আজ যে পুরুষ বা নারী আছে

তার জীবন, চিন্তা, অনুভূতি বা দৃষ্টিক্ষেত্র গোবিন্দলাল নগেন্দ্রনাথ, কুন্দ বা ভ্রমরের জীবন, চিন্তা, অনুভূতি বা দৃষ্টিক্ষেত্র নয়। আজকের গল্পলেখককে আজকের সমাজের ও মানব-জীবনের সাক্ষাৎ অনুভূতি লাভ করিয়া তারই রসচিত্র আঁকিতে হইবে, আজকের কবি রসিক চিত্তে যদি আঘাত করিতে যান তবে তাঁর আজকের জীবনের সাক্ষাৎ অনুভূতি হইতে করিতে হইবে তাঁর রস সঞ্চয়!

বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি প্রজ্ঞামূলক সাহিত্য যেমন নিত্য-নূতন আবিষ্কারের দ্বারা আপনাকে সজীব ও সুপ্রতিষ্ঠিত করে, সাহিত্যও তেমনি, নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল মানব-জীবনের ভিতর চক্ষু ডুবাইয়া রসের নিত্য-নূতন খনির সন্ধান করিয়া সজীব থাকে।

কাজেই সাহিত্য মাত্রেই প্রগতিশীল; প্রগতি ও সাহিত্যের সম্বন্ধ নিত্য।

তবু প্রগতি লেখক সঙ্ঘের "প্রগতি"র উপর ঝোঁকটা নিরর্থক বা অতিরিক্ত নয়।

'প্রগতি' কথাটার সম্বন্ধে লোকের মতভেদ আছে। সংসারের বেশীরভাগ লোক গতানুগতিক। বাঁধা খাতে চলিবার নিশ্চিন্ততাই বেশীর ভাগ লোকে এত পছন্দ করেন, যে নূতন পথ মাত্রকেই বিপথ মনে করিয়া তাঁরা চঞ্চল হন।

নূতন পথে চলিবার আকাঙ্খা বা সাহস যাদের আছে, তাদের মধ্যেও মতভেদের অভাব নাই। আমার পথই একমাত্র পথ, আর সব বিপথ, এমনি একটা ধারণা ইহাদের অনেকের মনে থাকে। তাই একজন যাহাকে প্রগতির পথ মনে করেন, অপরে তাহাকে অনেক সময়ই অধোগতির পথ বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রত্যেকে যে প্রগতির বিশিষ্ট স্বরূপ সম্বন্ধে একমত, ইহা হইতে পারে না। তবু তাঁদের ভিতরে প্রগতির সাধারণ রূপ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে কতকটা মিল আছে।

প্রগতির একটা সাধারণ লক্ষণ চলিত-সংস্কার হইতে মুক্তি। যাহা কিছু চলিয়াছে তাহাই চিরদিন চলিবে, প্রগতিশীল সাহিত্যক এ ধারণা রাখেন না। ভিন্ন ভিন্ন লেখক সংস্কারের ভিন্ন ভিন্ন অংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, কিন্তু তাঁদের সাধারণ লক্ষণ সংস্কার-মুক্তি।

চলিত-সংস্কারের বিরোধিতা মাত্রেই প্রগতি সূচিত করে না। চোর, ডাকাত, খুনে' দাঙ্গাবাজ প্রভৃতি বিশেষ-রূপে সংস্কারবিমুক্ত, কিন্তু তারা প্রগতির দূত নয়। প্রগতিকামী সংস্কার শুধু ভাঙ্গে নয়, সে তার স্থানে কিছু গড়িতে চায়। তার চক্ষে স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছে জীবন ও সমাজের একটা নূতন ও পূর্ণতর আদর্শ, সেই আদর্শের কাছে বর্ত্তমান সংস্কার যেখানে খাটো,

প্রগতিকামী সেই খানেই সংস্কার ভাঙ্গিয়া নূতন আদর্শের অনুকূল সংস্কার গড়িতে চায়।

প্রগতি লেখক সঙ্ঘের লক্ষ্য সেই সাহিত্যের পুষ্টি ও অভ্যুদয় যাহা সমাজ ও জীবনের একটা বৃহত্তর, পূর্ণতর আদর্শের আলোকে বর্ত্তমানকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে চায়।

সে আদর্শ সবার এক নয়। এক একজন হয়তো সমাজ-জীবনের এক একটা অঙ্গ লইয়া ভাঙ্গা গড়া করিতে চান। কেহ চান নীতিশাস্ত্রের নব সংস্কার করিতে, কেহ চান সমাজের আর্থিক অবিচার অনাচারের প্রতিবিধান করিতে, কেহ চান রাষ্ট্রীয় নীতির ভাঙা গড়া করিতে। ইহাদের সকলের মধ্যে একটি মাত্র সাধারণ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যাহা প্রগতি লেখক সঙ্ঘ আপনাদিগের নিজস্ব বলিয়া দাবী করেন। সে সাধারণ লক্ষণ এই যে, যে-আদর্শই যাঁহার লক্ষ্য হউক, সে আদর্শের লক্ষণ—স্বাধীনতা—ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণতম স্বাধীনতা। যাহা কিছু মানবের মানবত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ লাভের অন্তরায় তাহা বিদূরিত করিয়া মানবত্বের পূর্ণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা প্রয়োজন, সেই স্বাধীনতা প্রগতি-সাহিত্য সঙ্ঘের লক্ষ্য।

যাঁরা সাহিত্য রচনা করেন তাঁরা সকলে আদর্শবাদী নাও হইতে পারেন, তাঁদের চক্ষে আদর্শের এই পূর্ণরূপ নাও প্রকাশিত হইতে পারে। কোনও আদর্শ প্রতিষ্ঠার

প্রতিজ্ঞা লইয়া সকলে সাহিত্য রচনা না করিতে পারেন। কিন্তু যে সাহিত্যিকের চিত্তের স্বভাব ও গতি এই আদর্শের অনুকূল, যাঁর রচিত সাহিত্য হয় তো তাঁর অজ্ঞাতসারেও এই আদর্শের রঙে রঙীন, প্রগতি লেখক সঙ্ঘ তাঁহাকেই তাঁহাদিগের সমধর্ম্মী বলিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিয়া লইবেন। মানব-সমাজ ও সংস্কৃতির অগ্রগতির যাহা কিছু অনুকূল, সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার আদর্শের যাহা কিছু সহায়ক, তাহাই প্রগতি সাহিত্য বলিয়া সঙ্ঘ স্বীকার করিবেন।

বলিয়াছি, মানব-সমাজ প্রগতিশীল। সঙ্ঘ স্বীকার করিবেন সমাজের উপচীয়মান জীবন প্রতিদিন অতীতের জীবন ও অভিজ্ঞতার উপর নূতন সৃষ্টির অঙ্কুর ফুটাইয়া তুলিতেছে এবং তাহা হইতে নিত্য নবজীবন স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু মানবের এই প্রগতির পদে পদে করিতে হয় সংগ্রাম ; অতীতের সংস্কার, অসামাজিকের বিদ্রোহ প্রভৃতি ধ্বংশের অনুচর সমাজের বাঁচিবার ও বাড়িবার নিয়ত প্রচেষ্টাকে রুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য লড়াই করিতেছে।

আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যস্থলেও প্রগতিশীল সমাজের বিরুদ্ধশক্তির অভাব তো নাই-ই, নিত্য নূতন শত্রু মাথা তুলিয়া মানবের প্রগতি চেষ্টাকে বিধ্বস্ত করিবার উদ্যোগ করিতেছে।

মানুষ প্রকৃতির বুক ফুঁড়িয়া বাহির করিয়াছে সম্পদ, তাহার জীবন সুখ সমৃদ্ধ করিবে বলিয়া, সেই সম্পদ ধনিকের অর্থলিপ্সার ফলে আজ কোটি কোটি মানবের কত না দুঃখ কত অকল্যাণের হেতু হইয়াছে। বিজ্ঞান মানবের প্রধান গৌরব, মানবের কল্যাণ সাধনের শ্রেষ্ঠ যন্ত্র, সেই বিজ্ঞান আজ ধ্বংসের সেবায় বদ্ধপরিকর। সমাজ বাঁধিয়াছিল মানুষ জীবন পূর্ণতর ও অধিকতর আনন্দময় করিবার জন্য, তাই সমাজের বন্ধন আজ কঠিন নিগড় হইয়া তার মনুষ্যত্বকে নিষ্পেষিত করিতে চাহিতেছে।

অত্যাচার অনাচার দৃপ্ত পদক্ষেপে মেদিনী কম্পিত করিতেছে, নিপীড়িত মানব তার পদতলে নিষ্পেষিত হইতেছে। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে হিংস্র শক্তি আজ আন্দোলন করিয়া মানবের মানবত্ব ধ্বংস করিয়া তাহাকে ভোগ ও বিলাসের ক্রীতদাস করিতে স্পর্দ্ধা করিতেছে।

দিকে দিকে আজ ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে পীড়িত ও শঙ্কিত মানবের করুণ আর্ত্তনাদ, তাদের বাঁচিবার, সার্থকতা লাভ করিবার ব্যাকুল আবেদন।

মানবের মানবত্বকে আশঙ্কিত ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্ব মানবের সংহত চেষ্টার প্রয়োজন। মানবের সকল শক্তির আজ প্রয়োজন হইয়াছে সংহত হইয়া এই দুর্দ্ধর্ষ ধ্বংসপ্রচেষ্টার গতিরোধ করিবার। যাহার বাহুতে বল আছে, চিত্তে আছে যার ধীশক্তি ও ভাবুকতা,

কণ্ঠে আছে যার বাগ্মিতা, লেখনী যার শক্তিমান—সকলের সমবেত চেষ্টার আজ প্রয়োজন, মানবের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রগতিকে দৃপ্ত শক্তির মূর্ত্ত অকল্যাণের হস্তে আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার।

সেই ব্রতের উদযাপন কল্পে প্রগতি লেখক সঙ্ঘ একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

দল বাঁধিয়া সাহিত্য রচনা হয় না। প্রগতি করিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়াও সব সময়ে সু-সাহিত্য রচনা করা চলে না। দল বাঁধিয়া প্রগতি সাহিত্য রচনা করিব এ উদ্দেশ্য এ সঙ্ঘের নাই। সঙ্ঘের সভ্যগণের উপর প্রগতির দাবী ধরিয়া বাঁধিয়া প্রচার করিতেও সঙ্ঘ চাহেন না। কিন্তু যাঁরা প্রগতিকামী সাহিত্যিক তাঁহাদিগকে সমসূত্রে গ্রথিত করিয়া, প্রগতি-সাহিত্যের সম্যক প্রচার আলোচনা ও গবেষণা করিয়া, পরস্পর আনুকূল্যের দ্বারা প্রগতি-লেখক-সঙ্ঘ সাহিত্যে নিয়ত প্রগতির অনুকূল অবস্থা ও আবহাওয়ার সৃষ্টি করিবার ভরসা রাখেন। ইহাই সঙ্ঘের লক্ষ্য ও ব্রত।

প্রগতি

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বহুপূর্ব্বে প্রগতি নামে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখি। বিচিত্রায় সেটি প্রকাশিত হয়। তার শেষে লিখেছিলাম, 'আপাতত আমি এই বুঝি'। ইতিমধ্যে, অর্থাৎ গত দশ বৎসরে আমার মতের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। প্রগতিশীল লেখকদের অনুরোধেই আমার বর্ত্তমান মতামত সাজাবার সুযোগ হল। সেজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। *

প্রগতির অর্থ পরিবর্ত্তন, এবং যে ব্যক্তি প্রগতি কথা ব্যবহার করছেন তাঁর মতানুযায়ী দিকে পরিবর্ত্তন। কিসের পরিবর্ত্তন? যে বিষয়ের আলোচনা হচ্ছে তার ; এ-ক্ষেত্রে সাহিত্যের। কিন্তু সাহিত্য মানুষের কাজ, এবং মানুষ সামাজিক জীব, অতএব সর্ব্ব বিষয়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গেই সমাজের পরিবর্ত্তন সূচিত হচ্ছে। সমাজ একটি নিরালম্ব বস্তু নয়, তার জন্ম মৃত্যু উত্থান-পতন আছে, অর্থাৎ জীবন আছে। সমাজের জীবন এক হিসেবে ব্যক্তির জীবনের সমষ্টি। কিন্তু একটি ব্যক্তিরও অন্য ব্যক্তি-সমষ্টি অর্থাৎ সমাজ ভিন্ন পৃথক সত্ত্বা নেই। এই সংযোগ কেবল আধিভৌতিক দৈনন্দিন ব্যবহারেই নিবদ্ধ নয়, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক আচরণেও

* 'চিন্তয়সি'র শেষ কয়েক পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সত্য। শেষের দুটি স্তরের ব্যবহারও প্রথম স্তরের ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। পূর্ব্বে খাওয়া পরার সংস্থান, পরে ভাবসম্পদ, অতএব পূর্ব্বে সেই সংস্থান-সৃষ্টির পরিবর্ত্তন ও তার ফলে ভাবসম্পদ সৃষ্টির পরিবর্ত্তন। কিন্তু এদের মধ্যে হারের তারতম্য আছে। একটি সংস্থান-পদ্ধতির আশ্রয়ে জনকয়েক লোক লাভবান হয়, আইনকানুন, ধর্ম্ম নীতির সাহায্যে লাভ অক্ষুন্ন রাখাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক, তাই সংস্থান-পদ্ধতি স্থানু হয়ে পড়ে। কিন্তু বিজ্ঞানের বৃদ্ধিতে মন্দা পড়ে না। এই দুটী হারের বৈষম্যই স্থিতিস্থাপক ও গতিশীল দলের চিরন্তন বিরোধের প্রধান হেতু। সমাজের দিক থেকে, অর্থাৎ মানব জীবনের সংজ্ঞায় পূর্ব্বোক্ত বৈষম্যই প্রগতির প্রকৃত তাগিদ। বিরোধ না থাকলে গতি থাকত না, অতএব প্রগতিও অসম্ভব হোত। বিরোধের রূপান্তর প্রগতির এক একটি ধাপ। এই বিরোধের অবসানে প্রগতি নিরর্থক। ইতিমধ্যের ইতিহাসেই প্রগতির আলোচনা করা চলে, কারণ জীবনটাই অনাদি ও অনন্ত।

বলা বাহুল্য, প্রগতি সম্বন্ধে ধারণাও পরিবর্ত্তনশীল। তবে এ-টুকু জেনে তার প্রকৃতি বুঝতে চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত। যুক্তিকে নিরালম্ব না করলেই চলে। জ্ঞানের দ্বারা যে সমস্ত মূল্য ও স্বার্থ (Values and interests) যাচাই করা হয়েছে তার সমর্থনই যুক্তির সামাজিক কর্ত্তব্য। এই হিসাবেই প্রগতির প্রকৃতি আলোচনা করছি।

প্রগতির তিনটি স্তর আছে; তথ্য (facts), ঘটনা (events) এবং মূল্য (values)। প্রত্যেক স্তরের এক একটি উপযোগী মনোভাব আছে। তথ্যের বেলা বৈজ্ঞানিক, ঘটনার বেলা organismic

(বাংলা প্রতিশব্দ পাই নি), এবং মূল্যের বেলা দার্শনিক। মনোভাব অর্থে কর্ম্মরহিত ও স্তর অর্থে ইতর-ব্যাবর্ত্তক অবস্থার ইঙ্গিত করছি না। বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিশদ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কেবল এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে যতদূর মেক্যানিষ্টিক ব্যাখ্যা চলে ততদূর গ্রহণ করা, এবং তারপর যেখানে চলছে না সেখানে সে ব্যাখ্যা খাটাবার চেষ্টা করাই প্রগতিশীল লেখকদের তথ্য সম্বন্ধে কর্ত্তব্য। যদি নেহাৎ অসম্ভব হয় তবে চুপ করে যাওয়াই ভাল, অন্তত ইমার্জ্জেণ্ট এভোলিউশনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করার চেয়ে—কারণ শেষোক্ত ব্যাখ্যায় অজ্ঞানতাকে গালভরা নাম দিয়ে পদ্ধতিতে পরিণত করবার চেষ্টা অনেক স্থলে লক্ষ্য করেছি। আকস্মিক পরিবর্ত্তন জীবনে ঘটে, কিন্তু আকস্মিকতা সময়-সংক্ষেপ মাত্র, নতুন ধরণের পরিবর্ত্তন নয়। আরেকটি কথা বৈজ্ঞানিক মনোভাব সম্বন্ধে বলা উচিত। এরও একটা ইতিহাস আছে; আদিম যুগের যাদুকর ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন, মধ্যযুগের জ্যোতিষী ও বৈজ্ঞানিক, আবার পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারের অধ্যাপকও বৈজ্ঞানিক। এমন পদার্থবিদও আছেন যাঁরা কাগজে কলমে সিদ্ধান্ত কষে দেন, অন্য লোকে তার যাচাই করে। অর্থাৎ, ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায়, অবরোহ ও আরোহ দুই প্রণালীকেই বৈজ্ঞানিক ব্যবহার করেছেন, আজও করছেন। একই পরীক্ষায় অনুসন্ধানের অবস্থা ও ব্যবস্থা অনুসারে আরোহ অবরোহ পদ্ধতি উপযোগী। অতএব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির যখন ক্রমবিকাশ আছে তখন বৈজ্ঞানিক মনোভাবও চিরন্তন, সনাতন, শাশ্বত পদার্থ নয়। এ যুগে পরীক্ষার জয়জয়কার কোনো কোনো বিজ্ঞানে, যেগুলি অপেক্ষাকৃত অপরিণত সেগুলিতে, এবং পরিণত বিজ্ঞানে, যেমন ভূতবিদ্যায়, অবরোহ প্রথারই প্রচলন। কেন এই পদ্ধতির ও

মনোভাবের পরিবর্তন হচ্ছে বুঝতে গেলেই আমরা সমাজের দ্বারস্থ হব। হিন্দুদের মধ্যে বীজগণিতের এবং গ্রীকদের মধ্যে জ্যামিতির প্রত্যয়ের আবির্ভাবের জন্য সমাজে বাণিজ্যব্যবসায়ীর স্থানভেদই প্রধানত দায়ী, এ সত্য হগ্‌বেন দেখিয়েছেন। তেমনই আজকাল গণিতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্ত্তনেও, অর্থাৎ তার ফলে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের রূপভেদেও সমাজের নির্ব্বাচনপ্রক্রিয়া চোখে পড়ে। ব্যাপারটা এই : কোন্ সময় কোন্ পদ্ধতির রূপটি প্রচলিত হবে নির্ভর করছে সেই বৈজ্ঞানিক সমস্যার ইতিহাসের উপর, এবং সেই ইতিহাস ভাল করে পড়লে বোঝা যায় যে সে সমস্যার আদিতে কোনো না কোনো ব্যবহারিক সমস্যাই ছিল। মধ্যের অংশে সমাজ নির্ব্বাচনের ক্রিয়া সুস্পষ্ট নয়। অন্তে, অর্থাৎ কিছুকাল পরে ফলিত বিজ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞানের সাথে সমাজের পুনর্মিলন হয়। সে যাই হোক্, প্রগতিশীল লেখকদের তথ্যসংগ্রহ সম্বন্ধে মনোভাব বর্ত্তমান ও আগামী কালের বৈজ্ঞানিক মনোভাবই হওয়া চাই। বলা বাহুল্য, শ্রদ্ধাসহকারে তথ্যকে বোঝাটাই প্রথম কথা। সব তথ্য অবশ্য নয়, যে তথ্যের প্রয়োজন রয়েছে তাদেরই কথা বলছি। মানুষের মন, ভয়ভাবনাকে কেন্দ্র করে তথ্য সাজান পুরাতন সাহিত্যিকের লক্ষণ। বাইরের প্রকৃতির সাথে মানুষের সহানুভূতি দেখান রোম্যান্টিক মনোভাবের নিদর্শন। প্রগতিশীল লেখকের চাই প্রাকৃতিক তথ্যের অন্তরানুভূতি, 'সিম্প্যাথি' নয়, 'এম্প্যাথি'।

তথ্যের পর ঘটনা। পুরাতন সাহিত্যের পরিণতি ছিল একটি মাত্র সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে। সময় সম্বন্ধে কর্ত্তাদের ধারণা ছিল আলোকের মত। আলোকের রশ্মিগুলি যেমন লেন্সের ভেতর দিয়ে এসে একটি বিন্দুতে পরিণত হয়, তেমনই চরিত্রের অভিব্যক্তির ভেতর

দিয়ে এসে গোড়াকার শান্ত জীবন একটি চরম মুহূর্ত্তে পরিণত করানটাই তখনকার রীতি ছিল। এরই নাম গল্প বলার টেকনিক… ইত্যাদি। এখন, সময় সম্বন্ধে ধারণা বদলেছে, অতএব সঙ্কট ও কালান্তর এখন শেষে অবস্থান করে না। তারা গল্পের মধ্যে কবিতার মাঝ মধ্যখানেও অধিষ্ঠিত হয়েছে। প্রগতিশীল সাহিত্যে ঘটনার স্থান নির্দ্দিষ্ট নেই, কারণ কাল সম্বন্ধে পূর্ব্বেকার ধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে।

ঘটনা সম্বন্ধে দুটি মন্তব্য করতে চাই। কালকে উড়িয়ে দেওয়া একাধিক পণ্ডিতের মত। তাঁরা বলেন যে প্রত্যেক ঘটনাই বিচ্ছিন্ন, টুকরোভাবে দেখাই বৈজ্ঞানিকের কাজ, এবং জীবনটা পৃথক পৃথক ঘটনার সমাবেশ মাত্র, যেমন বায়স্কোপের চলন্ত ছবি ভিন্ন ভিন্ন ছবির দ্রুত পরিচালনা মাত্র। কিন্তু এ যুক্তিতে গলদ আছে। এখানে তথ্যের সঙ্গে ঘটনার পার্থক্য প্রকাশ পাচ্ছে না, অথচ সে পার্থক্যটা প্রকৃত। তা ছাড়া, চলন্ত ছবি চালায় কে, কি ভাবে চলছে, কোন হারে চলছে—এসব প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বোক্ত যুক্তির সাহায্যে পাই না। অথচ জীবনটা চলন্ত, বিশেষ ভাবে চলে, কখনও ঠায়ে, কখনও ধূনে, কখনও আমাদের বাঞ্ছিত দিকে, কখনও উল্টো দিকে। কিন্তু যে কোনো অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত সময়ে জীবনের মধ্যে একটা না একটা ভালমন্দ ছক্ খুঁজে পাওয়া যায়। এ ছক্ কি করে তৈরী হয়? উত্তর আসে—স্মৃতির সাহায্যে। কিন্তু স্মৃতির দোহাই দিলে জড়েরও স্মৃতি মানতে হয়। তাও আজকাল বলা হচ্ছে। কিন্তু তার প্রকৃতিটা কি? লৌহদণ্ডের স্মৃতি আছে যখন বলা হয়, তখন কি তার এই অর্থ নয় যে পুনঃ পুনঃ আঘাতের ফলে তার অণু পরমাণুর নক্সা একটি বিশেষ রূপে সজ্জিত

হয়েছে ? পুনরাবৃত্তিরই মধ্যে কালের খেলা রয়েছে। অতএব সময় থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখলে বিজ্ঞানের চলে না। অথচ প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে সান্তরতা ভিন্ন অন্য পন্থা নেই। সমগ্র জীবনটাকে ঐভাবে দেখলে সাহিত্য হয় বিফলতার বিবরণ, ব্যর্থতার কাহিনী, অর্থাৎ মূল্যহীন। কিন্তু প্রগতির মূল্য আছেই আছে, যখন কথাটি ব্যবহার করছি।

অতএব ঘটনা সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে এই যে কাল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সদর্থক হওয়া চাই। কোনো দার্শনিক আলোচনা না করে বলা চলে যে হিন্দুদের মতন মহাকাল নামক দেবতার কল্পনা করবার প্রয়োজন নেই বটে, তবু তার নিতান্ত ব্যক্তি-সম্পর্কহীনতা স্বীকারের প্রয়োজন আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি তথ্য অন্য তথ্যের সঙ্গে মিশে আছে নিতান্ত ঘনিষ্ঠভাবে, কার্য্যকারণ সম্বন্ধের তাগিদেই সাধারণত। এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিচারের ফলে আমরা বুঝি যে সব সময় যতটুকু কার্য্য একটি কারণের জন্য হওয়া উচিত তার বেশী কিংবা কম হচ্ছে। কখনও বা একই কার্য্যের একাধিক কারণ। এরূপ হয় কেন? তার ব্যাখ্যার জন্য কালাতিপাত মানতেই হয়। অর্থাৎ মাত্র অতিপাত কিংবা অতিক্রমের ফলে পূর্ব্বেকার তথ্য একটি বেগভার অর্জ্জন ক'রে পরের তথ্যকে ধাক্কা দিচ্ছে। যখন পরের তথ্য সেই বেগভার হজম করতে পারে না তখনই তাকে ঘটনা (event) বলাই শ্রেয়। ঘটনারও আবার বেগভার আছে যার ফলে অন্য ঘটনা তৈরী হয়। এই চল্‌ল চিরকাল। প্রগতিশীল সাহিত্যে ঘটনার প্রত্যাশা করি, যার বেগভার থাকবে, নতুন ঘটনা সৃষ্টি করবার ক্ষমতা থাকবে। পারম্পর্য্য (sequence) প্রগতির মূল কথা নয়। বেগভার প্রকাশ পাবার ঠিক পূর্ব্বেকার

অবস্থা পর্য্যন্ত সমাবেশের প্রকৃতি বাঁধাছাঁদা জৈব দেহের মতন, অর্থাৎ একটা তার ছক আছে। একটি 'ক্রাইসিস' থেকে অন্য 'ক্রাইসিসে' যাবার মধ্যে এই নক্সারই ছবি প্রগতিশীল সাহিত্যিককে আঁকতে হবে।

বর্ত্তমান জগতে যে প্রকার জীবন সম্ভব তাতে নক্সাগুলি অত্যন্ত একঘেয়ে। এই সমাজে ব্যক্তিগত জীবনে ঘটনা ঘটতে পারে না, যা পারে তার নাম তথ্যের পুনরাবৃত্তি ও বিচ্ছিন্নতা। সেজন্য যন্ত্রকে দায়ী করা রোমান্টিকেরই সাজে। যুক্তিতে বলে, যন্ত্রের সঙ্গে গতানুগতিকতার সম্বন্ধ থাকলেও তার নিকটতম আত্মীয় হল যন্ত্রের উপর অধিকার-বিভাগ। এক কথায়, সমাজে অধিকার-বৈষম্যের জন্যই জনসাধারণের জীবন অত একঘেয়ে। প্রগতিশীল লেখকদের এই সামাজিক তত্ত্বটুকু ধরতে হবে। যে ভাবে বাঁচছি তার চেয়ে ভাল ভাবে বাঁচতে চাওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। ভাল ভাবে মানে ঘটনাবহুল ভাবে। এটা একাধারে তথ্য ও তত্ত্ব।

ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই মূল্যের উৎপত্তি। ভাল ভাবে এবং আরো ভাল ভাবে জীবন চালাবার ইচ্ছার মধ্যেই মূল্য নিহিত রয়েছে। যে হিসেবে ঘটনা ধরেছি সেই হিসেবে ঘটনাবাহুল্যকে মূল্যের একটি অঙ্গ ধরা যায়। কিন্তু বাইরে থেকে মনে হয় যেন মূল্য একটি আবির্ভাব (emergent quality)। 'যেন' কথাটিতে সত্য-সন্ধানের কাল্পনিকতা ও আনুমানিকতাই সূচিত হচ্ছে। স্বার্থ (interests) এবং প্রাসঙ্গিকতার দ্বারা যখন তথ্যসমূদয় গ্রথিত হচ্ছে তখনই, যখন ভাব ও উদ্দেশ্যের দ্বারা এবং পূর্ব্ব ঘটনার বেগভারে নতুন ঘটনা সজ্জিত হচ্ছে তখনই মূল্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়ে গিয়েছে। মূল্যজ্ঞান জন্মায় সঙ্গে সঙ্গে এবং পরে। পূর্ব্বকাল থেকে,

ভাবি, অন্য দেশে তার সৃষ্টি হচ্ছে জানি, এবং সেই সঙ্গে আমাদের দেশে আঙ্গিকের অনুকরণ হচ্ছে, তার বেশী কিছুই হচ্ছে না আমার বিশ্বাস হয়েছে, তাই স্বাদেশিকতা জলাঞ্জলি দিয়ে শেষ প্যারাগ্রাফটি লিখলাম। জীবনে অনেক নতুন লেখককে ভিন্ন ভিন্ন কারণে সুখ্যাতি করেছি। সে জন্য আমার তিলমাত্র অনুশোচনা হয় না। কিন্তু সমাজজীবনের রূপপরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলেও যে নতুনত্ব সাহিত্যে আনা যায় তাকে প্রগতিশীল সাহিত্যের অভিনবত্ব বলে আমি আর ভুল করতে রাজি নই।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি

আঁদ্রে জিদ্

[অরুণকুমার মিত্র অনূদিত]

* ১৯৩৫ সালের ২১শে জুন তারিখে ফ্যাশিষ্ট বর্ব্বরতার আক্রমণ প্রতিরোধ কল্পে ম্যাক্সিম গর্কি, আঁরি বারব্যুস্ ও রম্যাঁ রলাঁর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক প্রগতিপন্থী লেখকসঙ্ঘের প্রথম অধিবেশন হয়। যাঁরা অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আঁদ্রে জিদ্, ই, এম, ফর্ষ্টার, আঁদ্রে মালরো, অল্ডস্ হাক্স্লি, জুলিয়াঁ বাঁদা, ওয়াল্ডো ফ্রাঙ্ক, মাইকেল গোল্ড্ ও জন ষ্ট্রেচির নাম আমাদের দেশে সুপরিচিত। এখানকার ফরাসী লেখকদের মধ্যে আঁদ্রে জিদের স্থান যে সকলের উপরে, বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর যে বক্তৃতার অনুবাদ নীচে দেওয়া হল, তা ইয়োরোপ ও আমেরিকার সাহিত্য-জগতে নবচেতনার সঞ্চার করেছিল। *

কতকগুলো প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করে দেওয়াই আমার এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য।

এই সব ভুল ধারণার প্রথমটি হচ্ছে এই যে, জাতীয়তাবাদীরা প্রায়ই আন্তর্জ্জাতিকতাকে ভুল বোঝে, তারা আন্তর্জ্জাতিকতাকে নিজের দেশের প্রতি বিদ্বেষ, স্বদেশকে অস্বীকার ও অবহেলা করার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে। তারা "দেশপ্রেমিক" কথাটাকে এত সঙ্কীর্ণ, এত অভিসন্ধিমূলক ও এত বিদ্বিষ্টভাবে ব্যবহার করে যে, তাতে কথাটার কদর্থই হয়। নিজের দেশকে ভালোবাসার প্রথম উপাদানই হচ্ছে অন্য দেশের প্রতি ঘৃণা—এ কথা মেনে নেওয়া আমরা কয়েকজন

অসম্ভব মনে করি। আমার কথা বল্‌তে পারি, আমি প্রখরভাবে ফরাসী থেকেও দৃঢ় আন্তর্জ্জাতিকতাবাদী। ঠিক ঐ ভাবে, আমি একান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হয়েও কমিউনিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত; প্রকৃতপক্ষে কমিউনিজম আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সহায়ক। আমি সব সময়েই বলেছি যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখ্‌লেই সমষ্টিকে প্রকৃষ্টভাবে সেবা করতে পারে। এরই সঙ্গে আজ 'করোলারী' হিসেবে জুড়ে দেওয়া যায় যে, এক কমিউনিষ্ট সমাজেই ব্যক্তি ও তার বৈশিষ্ট্যের সব চেয়ে বেশী বিকাশ হতে পারে, অথবা মাল্‌রোর ভাষায় "কমিউনিজম ব্যক্তিকে বিকশিত করে।"

ব্যক্তির সম্বন্ধে যা সত্য, জাতি সম্বন্ধেও তাই। সোভিয়েট রুশিয়ার যে সব গুণের আমি প্রশংসা করি তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে—বিরাট যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ছোট রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রদ্ধা—প্রত্যেক জাতি ও রাষ্ট্রের ভাষা, আচারব্যবহার, সংস্কৃতি ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রদ্ধা। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে প্রায়ই এই বলে ভর্ৎসনা করা হয় যে, সে তার বিশাল রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীকে সমান করে ফেল্‌তে চায়, একই স্তরভুক্ত করতে চায়; এবং পরে সমগ্র পৃথিবীকে নিয়ে তার এই খেলা খেলবার মতলব আছে। কিন্তু সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখান হয় তাতে এ অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

আমি সাহিত্যিক হিসেবে কথা বল্‌ছি এবং আমার মনোযোগ নিবদ্ধ রাখ্‌ছি সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতি। কিন্তু অন্য সব ক্ষেত্র থেকে সাহিত্যের ক্ষেত্রেই ব্যষ্টির উপর সমষ্টির, ব্যক্তির মধ্যে

সার্ব্বভৌম মানবতার এই জয় ঠিকমত উপলব্ধি করা যায়। ত্রিশ বৎসরেরও বেশী আগে আমি বলেছিলাম, "সেরভাস্তেস-এর চেয়ে কে বেশী স্পেনীয়, শেক্সপীয়রের চেয়ে কে বেশী বৃটিশ, গোগোলের চেয়ে কে বেশী রুশীয়, আর রাব্‌লে বা ভল্‌তেয়রের চেয়ে কে বেশী ফরাসী—অথচ এঁদের চেয়ে কে-ই বা বেশী সর্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌম?" এই সব লেখকের প্রত্যেকেই নিজের বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়েছিলেন বলেই আমাদের সর্ব্বজনীন মানবতার রাজ্যে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন। সুতরাং আপনাদের আমি একজন ফরাসী হিসেবেই সম্বোধন করছি; এবং আমরা সকলে যে গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি তাকে ফরাসী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই বিচার করছি, যা করা আমার উচিত।

প্রথমে আমি আমাদের সাহিত্যকে সাধারণ দিক দিয়ে বিচার করব।

একটু আগে রাব্‌লের উল্লেখ করেছি। ফরাসী সুকুমার সাহিত্যে তিনি একটা দুর্দ্দান্ত ভাবের প্রবর্ত্তন করেছিলেন। আমি উপরে বলেছি যে, তিনি বিশেষভাবে ফরাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি আরও বিশেষভাবে ছিলেন তাঁর যুগের লোক। প্রায় এই যুগের অব্যবহিত পরেই আমাদের সাহিত্য শান্ত, সংযত ও বিজ্ঞ হয়ে ওঠে। আমার কাছে সমগ্রভাবে ফরাসী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এই মনে হয় যে, সে বস্তুনিরপেক্ষ রাজ্যে নিজেকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে চায়; সঙ্কট, দুর্ব্বিপাক ও জীবনের বাস্তব বিঘ্ন থেকে সে সরে থাকে।

বলা বাহুল্য, আমি উল্লেখ করছি সেই সাহিত্যের যাকে বলা হয় "ক্লাসিকাল" সাহিত্য। এ সাহিত্যে গ্রন্থকার, দর্শক বা পাঠক এবং অভিনেতৃবর্গ (উপন্যাস বা নাটকের চরিত্র) সকলেই অভাব

থেকে দূরে থাকেন। সাহিত্যিকের কাজ এখানে অর্থবানদের জন্যে অর্থবানদের কাহিনী রচনা করা; আর লেখক যদি হ'ন অভাবগ্রস্ত তবে তাঁকে সে কথা চেপে রাখ্‌তে হবে! আর যে দুর্গতি ভাগ্যবানদের সমৃদ্ধির ভিত্তি সে সম্বন্ধে মাথা ঘামানও আমাদের কাজ নয়। এই সব বিরক্তিকর সমস্যার সঙ্গে সাহিত্য ও উচ্চ চিন্তার কোন সংস্রব নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—রাসিনের চমৎকার নাটকগুলি শুধু কাঁচের ঘরে শোভা পাওয়ার মতন ফুল। যে সব মানুষের কথা ঐ নাটকগুলির বিষয়বস্তু তারা সকলে বিশ্রাম-ভোগী, বোদ্‌লেয়রের রচনায় তাদের আছে প্রচুর "সুরভিত অবসর" (embalmed leisure); তাদের হাতে যথেষ্ট সময় এবং সে সময় তাদের প্রয়োজন হয় ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার বিকাশের জন্য।

এ সাহিত্য সম্বন্ধে রায় দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, কারণ এ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির আমার চেয়ে বড় ভক্ত কেউ নেই। প্রাচীন গ্রীসের পর সাহিত্যকলার এমন উৎকর্ষ আর হয় নি। সম্প্রতি আমরা এমন কথা শুনেছি যে, সপ্তদশ শতাব্দীর এই সব রাজারাণীর সম্বন্ধে আমাদের আধুনিকদের কোন আগ্রহ থাক্‌তে পারে না। যাঁরা একদিকে ঐ সব চরিত্রের কথা ও কাজের মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না এবং অন্যদিকে যে আবেগ ঐ সব অভিজাত-চরিত্রের আভরণ সেই আবেগের অকৃত্রিমতাকে বুঝতে পারেন না, তাঁদের জন্যে আমি দুঃখিত। তথাপি, নাটকের সব লোকই সুবিধাভোগী। এই ধরণের লোক নিয়েই এই সাহিত্যের কারবার এবং শুধু এদের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় এ সাহিত্য হয় বস্তুনিরপেক্ষ। আর্ট যখন জীবনের বাস্তবতা

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন তা হয়ে ওঠে কৃত্রিম। একমাত্র ল্যাটিন সাহিত্য এ বিষয়ে ক্লাসিকাল যুগের ফরাসী সাহিত্যকে হার মানায়। এ ছাড়া আমি এমন কোন ইউরোপীয় সাহিত্য জানি নে যা ফরাসী সাহিত্যের চেয়ে বেশী প্রাণহীন, বাস্তব জগতের সঙ্গে যার সংযোগ এত কম। ফরাসী সাহিত্য অবিরতই স্বপ্নরাজ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। শক্ত জমির উপরের ভিত্তি থেকে, জনসাধারণের জীবন থেকে সাহিত্য শক্তি ও নব যৌবনাবেগ আহরণ করে। এ সম্বন্ধে গ্রীক কাহিনীর গভীর তাৎপর্য্যটি আমাদের মনে আসে—দৈত্য আন্‌টিয়ুসের চরণ যতবার ধরণীমাতার স্পর্শ পে'ত ততবার তার শরীরে শক্তির নববিকাশ হত; কিন্তু হারকিউলিস যখন তাকে শূন্যে তুলে ফেল্‌লেন তখন সে বিড়ালছানার মত দুর্ব্বল হয়ে গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমাদের সাহিত্য যখন একান্তভাবে চাইছিল জীবনের নব প্রবাহ, তখন সে প্রবাহ এসেছিল মঁত্রেস্‌কিয়্যের কাছ থেকে নয়, এমন কি ভল্‌তেয়রের কাছ থেকেও নয়; এসেছিল সমাজের সাধারণশ্রেণীর লোক জ্যাঁ জাক্‌ রুসো এবং দিদেরোর কাছ থেকে।

ছাঁচ এবং সম্ভবত রূপের প্রতি অত্যধিক প্রীতির জন্যে ফরাসী সাহিত্য অনবরত কৃত্রিমতার রাজ্যে আকৃষ্ট হয়েছে। ক্লাসিক যুগের সাহিত্যের কৃত্রিমতা নষ্ট করবার জন্যে রোমান্টিসিষ্ট আন্দোলন যে চেষ্টা করেছিল তাতে আরও বেশী কৃত্রিম সাহিত্যেরই সৃষ্টি হয়েছিল। তা ছাড়া নতুন লেখকগোষ্ঠীর প্রধান প্রতিনিধিরা কেউই—লামার্তিন, ভিঞি, এমন কি ভিক্তর য়্যুগো পর্য্যন্ত—এঁরা কেউই জনসাধারণের মধ্য থেকে উদ্ভূত হন নি, কিংবা জনগণের তাজা রক্তের স্পন্দন জাগাতে পারেন নি সাহিত্যে। অবশ্য য়্যুগো

বেশ ভালই জান্‌তেন, মুক্তি আস্‌বে কোন দিক থেকে। য়্যুগো যে জনসাধারণের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের, জনসাধারণের নামে কথা বলার, তাদের প্রতিনিধিত্ব করার প্রবল চেষ্টা করেছিলেন, তার কারণই এই। য়্যুগোর এই চেষ্টাই এখনকার দক্ষিণপন্থীদের কাছে অত্যন্ত বিসদৃশ এবং য়্যুগোর নির্ব্বুদ্ধিতার প্রমাণস্বরূপ। আমিও অবশ্য মনে করি যে য়্যুগোর সুবিধাবাদ এর একটা কারণ; কিন্তু সে সুবিধাবাদ গভীর সহজাত অনুভূতির ফল।

কৃত্রিমতার দিকে, ভণ্ডামির দিকে আমাদের সাহিত্যের এই গতির উপর আমি যে খুব জোর দিচ্ছি, এতে কি অতিরঞ্জন হচ্ছে? আমি মনে করি না। জোলার স্বভাববাদের (naturalism) পরেই যে প্রতীকপন্থী (symbolist) প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, তাতেও এই গতি লক্ষ্য করি। এমন কি জোলার মধ্যেও (যাঁর গুণ ও প্রাধান্যকে বহু সমালোচক অন্যায় ভাবে উপেক্ষা করেছেন) আমি দেখি বিষয়কে সংশ্লেষণ করবার, বস্তুনিরপেক্ষ করবার একটা ঝোঁক; এর ফলে তাঁর সমস্ত "বাস্তববাদ" সত্ত্বেও তাঁর রচনা প্রেরণায় না হোক, ছাঁচে হয়েছে রোমান্টিসিষ্টদের অনুরূপ।

না, অতিরঞ্জন আমি একটুও করছি না; দক্ষিণ-পন্থীদের মধ্য থেকে একজন যে আমাদের সংস্কৃতির কৃত্রিমতা স্বীকার করেছেন এ জন্যে আমি আনন্দিত; তবে তিনি স্বীকার করেও সেই কৃত্রিমতাকেই সমর্থন করেছেন। মঃ তিয়েরি মল্‌নিয়ের "আক্‌সিয়ঁ ফ্রাঁসেজ" পত্রিকায় লিখ্‌ছেন, সভ্যতা হচ্ছে মিথ্যাচার। এ হচ্ছে স্বাভাবিক মানুষের স্থানে কৃত্রিম মানুষকে, নগ্নতার স্থানে পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ও মুখোসকে চালাবার চেষ্টা। কিন্তু সভ্যতার এই

স্বভাববিরোধী গতি, সভ্যতার এই অপূর্ব্ব মিথ্যাচারই সভ্যতার আসল উদ্দেশ্য, তার এবং আমাদের মহত্ত্ব—এ কথা যে অস্বীকার করে সে সভ্যতার বিরোধী।”

আমি বলি, “না”। আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে, সভ্যতাকে মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকৃতে হবে। এই রকম সভ্যতা—যা নিজে চায় ভূয়া হ’তে এবং নিজেকে ঘোষণাও করে তাই বলে’, যা মিথ্যাময় সামাজিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি এবং ফল—এইরকম সভ্যতার মৃত্যুর বীজ নিজের মধ্যেই রয়েছে। যে সব রচনা সে এখনও সৃষ্টি করছে তা মৃতপ্রায়, যে সমাজ তাকে সমর্থন করছে তারই মতন মৃতপ্রায়। আমরা যদি এই কৃত্রিমতাকে নষ্ট না করতে পারি তবে আমরা মর্‌ব। কৃত্রিম আবেষ্টনীতে লালিত সংস্কৃতির দিন চলে গিয়েছে; যদি জাতীয়তাবাদীরা তাকে সমর্থন করেন তবে ভালই; তাতে আমরা পরিষ্কার ভাবে দেখ্‌তে পাই এবং বুঝ্‌তে পারি যে, সংস্কৃতির প্রকৃত রক্ষকেরা আজ তাঁদের দিকে নেই, তারা বিপরীত তীরে, বিপক্ষ শিবিরে রয়েছে। অবশ্য আমি বল্‌তে চাই যে, এই সংস্কৃতিকে আক্রমণ কর্‌তে আমি আদৌ ইচ্ছুক নই, তার দানের আমি প্রশংসা করি। অতীতকে অস্বীকার করা বিফল ও হাস্যকর। এমন কি, এ কথাও আমি স্বীকার কর্‌ব যে, যে সংস্কৃতির স্বপ্ন আমরা দেখ্‌ছি তাকে অবিলম্বে উপযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয় এবং এ সংস্কৃতির উপক্রমণিকারূপে ‘একটা মিথ্যাচারী সংস্কৃতি প্রথমে নিশ্চয়ই আস্‌বে। তা ছাড়া, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যতই ঘৃণ্য মনে হোক, আমাদের ঈপ্সিত কমিউনিজমে পৌছবার পথে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটা আবশ্যকীয় পর্য্যায়।

কিন্তু আমি জোর গলায় বল্‌ছি যে, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা এই অতীত সংস্কৃতির বিরোধিতা করেই শুধু বিকশিত ও সমৃদ্ধ হ'তে পারে, এই সংস্কৃতির জের টেনে আর সে বাড়্‌তে পারে না। উপরোদ্ধৃত প্রবন্ধ-রচয়িতা আমাকে তিরস্কার করে' বলেছেন, আমি সংস্কৃতির শত্রু, কারণ আমি আন্তরিকতার দাবী নিয়ে যুঝি। আমার বৈরিতা আমাদের বর্ত্তমান সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নয়; সেই সংস্কৃতির ঝুটা রীতিনীতির বিরুদ্ধে। আমি দৃঢ়স্বরে বলি, তারাই হচ্ছে সংস্কৃতির শত্রু যারা মিথ্যাকে সমর্থন করে এবং সেই সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান মিথ্যাচারী সমাজ-ব্যবস্থাকে সমর্থন করে, আমি দৃঢ়স্বরে বলি, সংস্কৃতির শত্রু আজ ফাশিস্ত্‌রা, নাৎসীরা, এবং আমাদের স্বদেশের জাতীয়তাবাদীরা।

মঃ তিয়েরি মল্‌নিয়ের উপসংহারে বলেছেন, "দুটোর মধ্যে একটাকে আমাদের বেছে নিতে হ'বে—হয় সভ্যতা, নয় আন্তরিকতা।" আমি আবার বলি: আমি একথা মানি না যে, সভ্যতাকে কপট হতেই হবে (এই অভিমতের গূঢ় অর্থ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে); অর্থাৎ অন্য কথায়, আমি মানি না যে মানুষ মিথ্যাবাদী হলেই শুধু সভ্য হতে পারে, নচেৎ নয়। আমি আন্তরিকতা সম্বন্ধে এই ধারণাটিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে' মনে করি; কারণ ব্যক্তির মধ্যে তাকে আমি সীমাবদ্ধ রাখ্‌তে রাজী নই। আমার মত এই যে, সমগ্র সমাজটাই কপট; সে গণ-সাধারণের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করে, গণ-সাধারণকে কথা বলার সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত করুতে চায়; সে গণ-সাধারণকে এমনভাবে দাসত্ব-শৃঙ্খলিত, এমন পশুবৎ ও এমন অজ্ঞ করে রেখেছে যে, জনগণ নিজেরাই জানে না, তারা আমাদের কাছে কি বল্‌তে চায়, যদিও জন-সাধারণের ইচ্ছার সঙ্গে পরিচয়

হ'লে যে কোন উৎকৃষ্ট সংস্কৃতিই লাভবান হ'তে পারে। আমার জীবনের প্রারম্ভ থেকেই আমি তৎকালীন জাতীয়তাবাদীদের মতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি; তারা বল্ত ঃ "মানুষের যা বলার আছে মানুষ তা সবই বলেছে। সুতরাং এখন থেকে সে নিজের কথার পুনরাবৃত্তি কর্তে পারে মাত্র।" দুই শতাব্দী আগে ক্রুইয়ের এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, "আমাদের আস্তে বড়ই দেরী হ'য়ে গেছে।" তার দুই'শ বছর পরে আজ আমরা আশা ও আকাঙ্খা-পূর্ণ এক অজ্ঞাতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনুভব কর্ছি এক সমগ্র জগৎকে, যে জগতের মানুষ বীর্য্যবান, যৌবনোচ্ছল এবং নব নব সৃজন-প্রতিভায় মণ্ডিত। ক্রুইয়েরের দুইশ' বছর পরে আজ এইভাবে অনুভব করা নিশ্চয়ই খুব অভিনব।

এখন একটু পেছিয়ে গিয়ে আবার সুরু করা যাক। সাহিত্য বল্তেই বোঝা যায় সংযোগ-স্থাপন। আমাদের জান্তে হবে শুধু এই যে, সাহিত্য কার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করছে। কোন কোন সাহিত্যে, বিশেষ করে ফরাসী সাহিত্যে আমরা একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখি। প্রতিভাশালী সাহিত্যিক অনেক সময় নিজের জীবিতকালে বেশী পাঠক পান না। তা'হলে কি আমরা বল্ব যে, তিনি শুধু নিজের জন্যেই লিখ্ছেন? না; স্থানের হিসেবে যে সংযোগ তিনি স্থাপন কর্তে পার্লেন না, কালের হিসেবে তা স্থাপন করবার আশা তিনি কর্তে পারেন; তাঁর পাঠক-সম্প্রদায় ভবিষ্যতের মধ্যে বিস্তৃত। প্রথমে তাঁকে মনে হয় অদ্ভুত ও অতি অল্প লোকের বোধগম্য; তাঁর মূল্য বোঝা যায় না, তাঁর গুণ স্বীকৃত হয় না। আমি বোদ্লেয়র, র‍্যাঁবো, এমন কি স্তাঁদাল্এর মত লেখকদের কথা বল্ছি; স্তাঁদাল তো নিজেই বলেছিলেন যে, তিনি মুষ্টিমেয়

পাঠকের জন্যে লেখেন এবং তাঁর প্রকৃত পাঠকরা এখনও জন্মায় নি। নিট্‌শে, উইলিয়াম ব্লেক, হারমান মেল্‌ভিল্—এঁদের ভাগ্যও এই রকম হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে যে সকল লেখক উপযুক্ত সম্মান পান নি, তাঁদের শ্রেষ্ঠদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের নাম আমি উল্লেখ করলাম।

এঁদের প্রত্যেকের রচনাতেই যোগাযোগ স্থাপনের একটা সত্যিকার অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, কিন্তু সে যোগাযোগ আশু নয়, কালের ব্যবধান পার হ'য়ে। এ থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি যে, কোন গ্রন্থকার প্রথমে বেশী পাঠক না পেলে তাঁকে আমরা অবজ্ঞা কর্‌তে পারি না।

আমি স্বীকার কর্‌ছি যে, মস্কোতে লেখক সম্মেলনে বিভিন্ন ধরণের বহু শ্রমিক গ্রন্থকারদের সম্বোধন করে' যে কথা বলেন আমি তাতে একটু পীড়া বোধ করেছিলাম ; শ্রমিকরা গ্রন্থকারদের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন, "আমাদের কথা লিখুন, আমাদের চিত্র আঁকুন।" দর্পণ হওয়া সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, অন্তত সমগ্র উদ্দেশ্য নয়। এতদিন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এই ভূমিকা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল, এবং এই ভূমিকায় সে কতকগুলি উৎকৃষ্ট জিনিষও সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু সাহিত্যের ঐখানে চুপ করে থাক্‌লেই চল্‌বে না। এই নতুন মানুষ, যাকে আমরা ভালবাসি, যাকে আমরা কামনা করি, সে যাতে বাধানিষেধ, নিরর্থক সংগ্রাম ও কপটতা থেকে মুক্তি পায় সে জন্যে তাকে সাহায্য করার প্রশ্নই সাহিত্যের প্রধান কথা। নতুন মানুষের গঠন ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করা প্রয়োজন। ঐ মস্কো

কংগ্রেসে বুখারিন, গোর্কি নিজে এবং অন্য অনেকে চমৎকারভাবে এই কথাই ব্যক্ত করেন। সাহিত্য শুধু অনুকরণে তুষ্ট নয়, সে তথ্য দেবে, প্রস্তাব আন্‌বে, সৃষ্টি করবে।

অতীতের যে সকল শ্রেষ্ঠ লেখক তাঁদের জীবিতকালে সমাদর পান নি, কিন্তু আজ যাঁদের পাঠক-সংখ্যা বিপুল, তাঁরা মানুষের আত্মজ্ঞানকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন নিজেরা অভূতপূর্ব্ব আত্মজ্ঞান উপলব্ধি করে'—মানুষ তখন যেমন ছিল বা যেমন নিজেকে মনে করত সেই ভাবে তাকে আঁক্‌লে তাঁরা কখনই এমন আন্তরিকতা অর্জ্জন কর্‌তে পারতেন না—তাঁদের এই আন্তরিকতাই মানুষের আত্মজ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে। সংযোগ স্থাপনই অবশ্য লেখকের লক্ষ্য হবে, কিন্তু সব সময়ে প্রথম চেষ্টাতেই তিনি এতে সফল হবেন না। আমার নিজের কথা ধরুন (আমার নিজের সম্বন্ধে উল্লেখ করার জন্যে ক্ষমা করবেন) ঃ আমি জন্মে ও শিক্ষায় বুর্জ্জোয়া হ'লেও আমার সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভ থেকেই অনুভব করতাম যে, আমার মধ্যে যা কিছু খাঁটি, যা কিছু মূল্যবান, যা কিছু সাহসিক, তার সঙ্গে প্রচলিত রীতিনীতি, অভ্যাস ও আমার পারিপার্শ্বিক মিথ্যাচারের ঠোকাঠুকি লাগ্‌ছে। আমার মতে আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রকৃত সাহিত্যকে বিরোধিতার সাহিত্য হতে হ'বে, না হ'য়ে উপায় নেই।

সুতরাং বুর্জ্জোয়া লেখকের পক্ষে তাঁর নিজের শ্রেণীর কাছে কথা বলা অসম্ভব। আর জনগণের কাছে কথা বলা···আমি বলি সে-ও অসম্ভব। যতদিন জনগণ আজ্‌কের মত অবস্থায় থাক্‌বে, তারা যা হ'তে পারে, তাদের যা হওয়া উচিত এবং আমরা সাহায্য করলে তারা যা হবে তা যতদিন তারা না-হয়, ততদিন তাদের কাছে

কথা বলা অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হচ্ছে ভবিষ্যতের অজ্ঞাত পাঠকের জন্যে লেখা, এই দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে লেখা যে আমাদের নিজেদের মধ্যে একবার যদি আমরা মানবসত্ত্বাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি তবে আমাদের কথা তার কাছে পৌঁছুবেই। সোভিয়েট্ যুক্তরাষ্ট্র আমাদের সাম্‌নে আজ অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য ধরেছে, এর গুরুত্ব বিরাট, আশাতীত ও আদর্শস্থানীয়। এই সেই দেশ যেখানে লেখক সোজাসুজি তাঁর পাঠকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। আমাদের যেমন স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কাট্‌তে হয়, এখানে তার বদলে লেখককে শুধু স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে দিতে হয়। তাঁর চারিদিকের বাস্তবে তিনি একই সঙ্গে পান প্রেরণা, পদ্ধতি ও তাঁর রচনার প্রতিধ্বনি। এর বিপদও আছে নিঃসন্দেহ; কারণ আর্ট-স্থষ্টির তাৎপর্য্যই হচ্ছে কোন বাধাকে জয় করা। কিন্তু এই নতুন ধরণের বিঘ্ন সম্বন্ধে পরে কথা বল্‌বার সময় পাওয়া যাবে। আমি নতুন সোভিয়েট্ সাহিত্যে প্রশংসনীয় স্থষ্টি দেখেছি; কিন্তু এখনও এমন রচনা দেখিনি যাতে নতুন মানুষ—যাকে এই সাহিত্য গড়ছে এবং আমরা যার প্রতীক্ষা করছি, সে মানুষ রক্তমাংসে পূর্ণাবয়ব হয়ে উঠেছে। এখনও আমাদের সাম্‌নে রয়েছে সংগ্রাম, এখনও রয়েছে গর্ভধারণকাল ও প্রসব-বেদনা। আমি বিরাট পটভূমিকায় আঁকা নবকালের বার্ত্তাবাহী রচনার জন্যে প্রতীক্ষা কর্‌ছি, যে রচনার মধ্য দিয়ে লেখক বাস্তবকে অতিক্রম করে তার অগ্রদূত হবেন, বাস্তবকে পথ দেখিয়ে যাবেন আগে আগে।

আমরা আজও নতুন মানুষের আগমন প্রতীক্ষা কর্‌ছি; আমাদের ক্লিষ্ট ও পীড়িত পাশ্চাত্ত্যে হয় তো এখনও দীর্ঘ কাল

আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তার প্রসবের বেদনা এখনও শেষ হয় নি। সংগ্রাম, যন্ত্রণা, প্রসব-বেদনা—এ সব এম্‌নি কিছু ভালো নয়, কিন্তু এদের মধ্যে দিয়ে যে জন্মের সূচনা হয় তারই জন্যে এরা ভাল।

প্রত্যেক স্থায়ী আর্ট-সৃষ্টিতে—নিত্য নব কামনা তৃপ্তি করতে পারে যে সব সৃষ্টি তাদের প্রত্যেকটিতে এমন কতকগুলো গুণ আছে যা কোন একটা শ্রেণীর বা একটা যুগের মানুষের প্রয়োজন মেটানর চেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠতর। যাঁরা এ বিষয়ে উৎকর্ষ দেখিয়েছেন তাঁদের রচনা পাঠে উৎসাহ দেওয়া নিশ্চয়ই ভাল। পুশ্‌কিনের লেখার পুনর্মুদ্রণ করে' এবং শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটক অভিনয় করে' সোভিয়েট রুশিয়া সংস্কৃতির প্রতি তার আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় দিয়েছে। নিজের সাফল্যের মহিমা কীর্ত্তন করে' ছাপাখানা থেকে গাদা গাদা বই (যার অধিকাংশের হয় তো সাময়িক মূল্যের বেশী কিছু আর নেই ; অবশ্য অনেক উৎকৃষ্ট রচনাও আছে), বার করার চেয়ে সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্তির এ বড় প্রমাণ। তবে আমার মতে এতে একটা ভুল করা হচ্ছে, সে হচ্ছে—ঐ সব শ্রেষ্ঠ রচয়িতাদের রচনায় কি কি জিনিষের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত তার উপর বেশী জোর দেওয়া, কি কি শিক্ষা তাঁদের রচনা থেকে আমরা নেব তা অযথা নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া।

কারণ, যে কোন রচনা শিক্ষা দেয় সম্পূর্ণ তার সৌন্দর্য্যের দ্বারা ; কোন একটা শিক্ষা নিতেই হ'বে বলে' তন্ন তন্ন করে খোঁজার মধ্যে, রচনার প্রসাদগুণকে (quiétif) বাদ দিয়ে তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে একমনে যাচাই করার মধ্যে আমি সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে একটা অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা দেখ্‌তে পাই। তা ছাড়া আমি মনে করি

প্রত্যেককে তার নিজের রুচি, জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে শ্রেষ্ঠ রচনার ব্যাখ্যা করতে দেওয়া উচিত। যদি কেউ নিয়মমাফিক বা 'সরকারী' শিক্ষা থেকে ভিন্ন রকম কোন শিক্ষা পায় তা হলেও সে-ই হয় তো আসলে ঠিক হ'তে পারে; আর সে যদি ভুলও করে তবু তার ভুল গৃহীত মতের প্রতি অন্ধ আত্মসমর্পণের চেয়ে তার পক্ষে বেশী মঙ্গলকর। সংস্কৃতির লক্ষ্য মনকে মুক্ত করা, শৃঙ্খলিত করা নয়।

শুধু কমিউনিজ্‌মের শত্রুরাই কমিউনিজ্‌মের মধ্যে সকলকে এক ছাঁচে ঢালবার অভিপ্রায় দেখ্‌তে পায়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আমরা যা প্রত্যাশা করি এবং যা কঠিন সংগ্রামকালে ও সাময়িক বিধি-নিষেধের (অবশ্য এর উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপকতর মুক্তির ব্যবস্থা করা) পর আজ দেখ্‌তে পাচ্ছি তা হচ্ছে—এক সামাজিক রাষ্ট্র যেখানে প্রত্যেক মানুষ তার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়। আমাদের হতভাগ্য পাশ্চাত্যে আমরা অনেক পিছনে পড়ে আছি। তবে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে অন্তত সামাজিক প্রশ্ন সমস্ত বিষয়কে ছাড়িয়ে গেছে, কিন্তু এর কারণ এ নয় যে সামাজিক প্রশ্ন নিজগুণে আমাদের কাছে বেশী আগ্রহের বস্তু হ'য়ে উঠেছে, এর কারণ হচ্ছে এই যে সমাজের অবস্থার উপরেই সংস্কৃতির অবস্থা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে; সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ আছে বলেই আমরা চল্‌তে বাধ্য হ'চ্ছি: যতদিন সমাজ এখন যেমন আছে তেমন থাকবে ততদিন তার পরিবর্ত্তনসাধনই হবে আমাদের প্রধান চিন্তা।

আজ আমাদের সমস্ত সহানুভূতি, যোগাযোগ স্থাপনের সমস্ত কামনা নির্য্যাতিত, প্রবঞ্চিত ও পীড়িত মানুষের দিকে ছুটেছে। কিন্তু মানুষের ক্ষুধা, যন্ত্রণা ও পীড়ন যখন থাকবে না তখন মানুষ আর আগ্রহ জাগাবে না, এ মত আমি মেনে নিতে পারি না।

আমি মেনে নিতে পারি না যে, মানুষ যতক্ষণ দুর্গত থাকে ততক্ষণই শুধু আমাদের সহানুভূতি পেতে পারে। এ কথা সত্যি যে, দুঃখ অনেক সময় আমাদের আত্মাকে মহত্তর করে। দুঃখ আমাদের ধ্বংস না করতে পারলে আমাদের দৃঢ়তর ও শ্রেষ্ঠতর করে। তবুও আমি ধ্যান করি, একান্তভাবে কামনা করি সেই সামাজিক অবস্থাকে যেখানে আনন্দ থেকে কেউ বঞ্চিত থাক্‌বে না। যে মানুষকে দুঃখের বদলে আনন্দই মহৎ কর্‌বে সেই মানুষের আগমন আমি প্রতীক্ষা কর্‌ছি।

ইংলণ্ডে স্বাধীনতা

ঈ, এম্, ফর্স্টার

[আবু সয়ীদ আইয়ুব অনূদিত]

* 'A Passage to India'র লেখক ঈ, এম্, ফর্স্টারের পরিচয় আমাদের দেশে নিষ্প্রয়োজন। প্যারিসের আন্তর্জাতিক লেখক সঙ্ঘের সম্মেলনে তাঁর বক্তৃতার অনুবাদ দেওয়া হল। *

এই পরিষৎ যখন বক্তৃতা দেবার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে আমাকে গৌরবান্বিত করলেন এবং তার একটি বিষয় নির্ব্বাচন করতে বললেন, তখন উত্তরে আমি জানিয়েছিলাম যে আমার বিষয় হবে "মতপ্রকাশের স্বাধীনতা" অথবা "সংস্কৃতির ঐতিহ্য"—পরিষদের যেটা মনঃপূত, তবে উভয় প্রসঙ্গে আমি একই বক্তৃতা করব ব'লে স্থির করেছি। ইংরেজ ছাড়া আর কারও মুখে এই কথাটি ব্যঙ্গোক্তির মতো শোনাত। কিন্তু আমাদের দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে স্বাধীনতা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে দু'টোর একত্র আলোচনা সেখানে কষ্টকল্পনা নয়। স্বাধীনতার স্তোত্রপাঠে ইংলণ্ড বহু শতাব্দী ধ'রে অভ্যস্ত। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা কিম্বা আত্মত্যাগের স্তুতিও কম হয় নি, কিন্তু স্বাধীনতার মহিমা-কীর্ত্তনেই সব চেয়ে বেশি লোকের কণ্ঠ সর্ব্বদা মেতেছে। আজ যদি আমাদের সাহিত্যিকবৃন্দ সেই

চিরাগত ঐতিহ্যের ধারাটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, যদি আজকের সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমরা সেই কথা বলতে ভরসা পাই, মিল্‌টন শেলী ও ডিকেন্‌স্‌ তাঁদের যুগে যা বলতে পেরেছিলেন, তা হলে ভাবব যে অন্তত এদিক থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ তিমিরাচ্ছন্ন নয়।

আমি জানি আমাদের এই স্বাধীনতা কত সংকীর্ণ, কত ত্রুটিতে কত কলঙ্কে পরিপূর্ণ। এর পরিব্যাপ্তি একটি জাতির মধ্যে এবং সে-জাতির একটি শ্রেণীর মধ্যে নিবদ্ধ। এ-স্বাধীনতা ইংরেজের জন্য, তার সাম্রাজ্যভুক্ত অশ্বেতাঙ্গদের জন্য নয়। কোন সাধারণ ইংরেজকে যদি বলা হয় তার স্বাধীনতার উত্তরাধিকারে ভারতবর্ষ ও কেনিয়া-বাসীদেরও শরীক করতে, তাহলে 'টরি' হলে সে উত্তর দেবে "কস্মিন কালেও না", এবং 'লিবরেল' হলে বলবে "তারা আগে যোগ্য হোক, তখন ভেবে দেখব"। গত বৎসর জেনেরল স্মাট্‌স্‌ সেণ্ট এণ্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভায় একটি জম্‌কালো বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সে-বক্তৃতায় তিনি যা বললেন তার প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু একটি কথা তিনি বলেন নি। তিনি কোথাও ঘুণাক্ষরেও ইঙ্গিত করেন নি, মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তাও করেন নি, যে যে-স্বাধীনতার বন্দনা তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে নির্ঘোষিত হল তা দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় জাতিদেরও প্রাপ্য। এই একটি ত্রুটি তাঁর সমস্ত প্রশস্তিকে প্রহসন ক'রে দিল।

তার পরে শ্রেণীর কথা। ইংলণ্ডে স্বাধীনতা তারাই ভোগ করে যাদের ট্যাঁকে পয়সা আছে। যার দু'বেলা অন্নের সংস্থান নেই স্বাধীনতায় তার. পেট ভরে না। আমাদের লেখকগোষ্ঠীর কাছে

আত্মপ্রকাশের স্বর্গাধিকার যতই অমূল্য হোক, সরকারী মুষ্টিভিক্ষার উপর যার দিনগুজ্‌রান, এসব নিয়ে মাথা ঘামানো তার পোষায় না। সে জানে যে স্বাধীনতা হল বড়লোকের ব্যসন ; যারা নিশ্চিন্তে খেয়ে দেয়ে তোয়াজ ক'রে বেড়ায়, আইন অমান্য করার বাবুগিরি তাদেরই শোভা পায়। আমার নিঃস্বপ্রায় বন্ধু এবং একেবারে নিঃস্ব আত্মীয় কয়েকজন আছেন। এ-সম্মেলনের উপর তাঁদের অনাস্থা অবজ্ঞায় গিয়ে ঠেকেছে। স্বাধীনতায় যে আমার মতো বিশ্বাস করে অথচ চোখ কান বুজে থাকা যার অভ্যাস নয়, এই তিক্ত বিদ্রূপের ভাব সে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছে নিশ্চয়ই। নিরন্ন ও নিরাশ্রয় যারা তারা স্বাধীনতার জন্য উদ্‌গ্রীব নয়, সংস্কৃতির ঐতিহ্য নিয়েও বিচলিত নয়। একথা স্বীকার করতে না চাওয়া নিছক ভণ্ডামি !

আমাদের জাতিগত ও শ্রেণীগত সংকীর্ণতা সম্বন্ধে আমি সত্য গোপন করি নি, কারণ তা সত্বেও আমি স্বাধীনতার আদর্শে নিষ্ঠাবান, এবং আমার বিশ্বাস যে তার যে-বিশিষ্ট রূপটি ইংলণ্ডে পরিস্ফুট হয়েছে তার সার্থকতা আজো ঘুচে যায় নি—ইংলণ্ডের জন্য এবং সমস্ত পৃথিবীর জন্য। আমার রাষ্ট্রনীতি যে ফাশিস্ত্‌ নয় তা আপনারা অনুমান ক'রে থাকবেন ; ফাশিস্‌ম্‌-এর কর্ম্ম ও কাম্য দুই-ই অসৎ। আমি সাম্যবাদীও নই। হতে পারতাম, বয়স কম আর সাহস বেশি থাকলে, কারণ সাম্যবাদে আমি এখনো আশার স্ফুলিঙ্গ দেখতে পাই। তার কর্ম্মপদ্ধতি যে সব ক্ষেত্রে আমার মনঃপূত তা নয়, তবে উদ্দেশ্য তার শুভ বলেই জানি। আমার যুগ এবং আমার শিক্ষা আমাকে যা গড়েছে আমি তাই—অর্থাৎ একজন বুর্জ্জোয়া, ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের খুঁটিটাকে যে চোখ বুজে আঁকড়ে

রয়েছে যদিও সে জানে যে ঐ খুঁটির কাঠে ঘুণ ধরেছে। এ-অসম্মানের লজ্জাটাও আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। আমাদের অতীত যুগকে আমি শ্রদ্ধা করি; সে-যুগের মৌরুসে আমরা যে-স্বাধীনতা পেয়েছি তার সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধনকে একান্ত আবশ্যক জ্ঞান করি। তাই আজ আমি এখানে এসেছি আপনাদের কাছে জানবার জন্য অন্য সব দেশে কোন্ পথে এ-চেষ্টা চলেছে, কোন্ দুঃখের মধ্যে দিয়ে। আমাদের দেশেও আজ দুর্দ্দিন। তবু আমাদের কর্ত্তাদের যে মুখে অন্তত স্বাধীনতা ভড়ংটুকু বজায় রাখতে হচ্ছে সেটা মস্ত সুবিধে। শেক্সপীয়রের ব্যক্তিগত মতামত যাই থাক, কবিগুরু ভণ্ডামির মাহাত্ম্য বুঝতেন। হ্যাম্‌লেট তার বিপথগামিনী মাতাকে যে-সম্ভাষণ করেছিল, আমরা পার্লামেণ্টের আদি জননীকে সেই সম্ভাষণে অভিহিত করতে পারি:

Good night ; but go not to mine uncle's bed ;
Assume a virtue, if you have it not.
That monster, custom, who all sense doth eat,
Of habits devil, is angel yet in this,
That to the use of actions fair and good
He likewise gives a frock or livery,
That aptly is put on.

ব্রিট্যানিয়া দেবী আজ কুলত্যাগিনী হতে চাইলে একটু বিব্রত হবেন। এত কাল তিনি পতিভক্তির বহ্বাড়ম্বর ক'রে এসেছেন ব'লে কলঙ্কের কথা চেপে রাখতে অধিকতর বেগ পেতে হবে। তাই তো আমাদের কাছে রাষ্ট্রব্যবস্থার বহিরাবরণ, ন্যায়বিচারের

বাহ্যরূপ এত গুরুত্বপূর্ণ, তাদের উপর কড়া নজর রাখা এত আবশ্যক। "Mine uncle's bed" পার্লামেন্ট-গৃহের বেঞ্চিগুলির অত্যন্ত কাছাকাছি, এবং সতী সাধ্বীদের মন ভাঙ্গানোর পক্ষে তার প্রলোভন দুর্নিবার—সে-"uncle" স্তর অস্‌ওয়াল্‌ড মস্‌লে হলেও। অবশ্য এটাও কম কথা নয় যে ইংলণ্ডে আজো ডিক্টেটরগিরিকে অভদ্র ভাবা হয়, ইহুদিদের মেরে ফেলাকে বদ্‌রুচি বলা হয়, এবং বেসরকারী সৈন্যদের যাত্রার সঙ মনে করা হয়।

যুদ্ধের সম্ভাবনা বাদ দিলে ফাশিস্‌ম্‌কে ভয় করবার কারণ তেমন নেই, আর যুদ্ধ একবার বাধলে যে কোন অঘটন ঘটবে না তা যুদ্ধের দেবতাই জানেন। আমাদের শত্রুরা আসবে অন্য পথ দিয়ে, শান্ত শিষ্ট ভাল মানুষটি সেজে—আমি তাদের নাম দিয়েছি ফেবিয়ো-ফাশিস্‌ট্‌। তারা ডিক্টেটরি করে চুপে চুপে, নিময়-তান্ত্রিকতার আড়ালে আব্‌ডালে; হয় তো বা ছোট্ট একটি আইন পাশ করে (সিডীশন আইনের মতো); আফিসের বড় কর্ত্তাদের জবরদস্তিকে ধামা চাপা দিয়ে বেমালুম চালিয়ে দেয়; বলে সরকারী বিধিব্যবস্থা গোপন না থাকলে দেশের আর রক্ষা নেই; আর তাদের নিজস্ব "সংবাদ"গুলি প্রতিসন্ধ্যায় বেতারে এমন মিষ্টি ক'রে এমন স্নেহার্দ্র কণ্ঠে জানায় যে প্রতিপক্ষ চুপ করে যায়, পোষ মেনে যায়। এই ফেবিয়ো-ফাশিস্‌ম্‌কে আমি সব চেয়ে ডরাই, কারণ ইংলণ্ডে স্বাধীনতা-হরণের এই হচ্ছে সনাতন প্রথা। এই প্রথা ছিল রাজা প্রথম চার্ল্‌স্‌-এর—তার মতো খাঁটি ভদ্রলোক কজনই বা দেখা যায়। এই প্রথা আমাদের অধুনাতন সুশিক্ষিত সুভদ্র রাজপুরুষদের। ফেবিয়ো-ফাশিস্‌ম্‌ আমাদের চিরপরিচিত শত্রু, বহু শতাব্দীর উপর তার নির্য্যাতনের ছাপ :

He shall mark our goings,
question whence we came,
Set his guards about us,
as in Freedom's name.
He shall peep and mutter,
and the night shall bring,
Watchers 'neath our window,
lest we mock the king.

"As in Freedom's name"—কিপ্‌লিং চমৎকার লিখেছেন। তবে এই স্তবকটা তুলে দেবার জন্য তিনি আমাকে ধন্যবাদ জানাবেন না নিশ্চয়ই।

[এর পরে কয়েকটি প্যারা ধরে সিডীশন আইন ও তিনটি পুস্তক বাজেয়াপ্তির বিবরণ আছে। এ সমস্ত আমাদের দেশের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, দৈনিক কাগজ-গুলির সম্পাদকী-রচনার প্রধান উপকরণ। তর্জ্জমা থেকে বাদ দেওয়া অসঙ্গত হবে না আশা করি।]

তথ্যের খুঁটিনাটি থেকে ফিরে আসা যাক একটি সর্ব্বব্যাপী প্রচেষ্টার উদ্বোধন প্রসঙ্গে—আমার যতদূর মনে হয় তাই আমাদের সম্মেলনের মূল প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে আপনাদের সামনে পেশ করবার মতো আমার কিছু নেই। আমি কী চাই সেটুকু অবশ্য আমি জানি, এবং তাই সংক্ষেপে ব্যক্ত করব। আমি চাই সাহিত্য-সৃষ্টিতে ও সাহিত্যবিচারে পূর্ণতর স্বাধীনতা। বিশেষত ইংলণ্ডে লেখকদের সৃজনশক্তি ব্যাহত হচ্ছে যৌন প্রসঙ্গে তাঁরা স্বচ্ছন্দে লিখতে পারছেন না ব'লে; আমি চাই একথার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি যে

ঐ প্রসঙ্গটির গভীর বিশ্লেষণ ও লঘু বিবরণ দুই-ই আবশ্যক। এর দ্বিতীয় দিকটা বক্তৃতামঞ্চে প্রায়ই উপেক্ষিত হয়ে থাকে ব'লে আমি বিশেষ ক'রে সে কথা পাড়লাম। সমালোচনার দিক দিয়ে আমি চাই সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সব কিছুর ভালমন্দ-বিচারের নির্বিঘ্ন অধিকার। ইংলণ্ডে আমাদের বরাং ভালো, আমরা এখনো সেটা থেকে বঞ্চিত হই নি, যদিচ বাইরে কোনো কোনো দেশে তার অন্তর্ধান ঘটেছে। কিন্তু এই অধিকারকে সার্থক করতে হলে শ্রোতারও দরকার, কাজেকাজেই আমি চাই মতপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হরেক রকম মতপ্রচারেরও পরিপূর্ণ সুযোগ। এদিক দিয়ে ইংলণ্ডেও অন্য দেশের মতো বিঘ্নের সৃষ্টি হয়েছে, প্রধানত বেতারের উপর সরকারী দখল পাকা হবার পর থেকে। সর্ব্বোপরি আমি চাই আমাদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে।

এতে আমার কর্ত্তব্য কী? আমি চেষ্টা করব নিজের দেশে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের সম্পূর্ণ সুযোগটুকু গ্রহণ করতে, এবং যা কতিপয় ধনী ও শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ তাকে সর্ব্বশ্রেণী ও জাতির অধিগম্য করতে। আর চেষ্টা করব ইংরেজ লেখকদের সঙ্গে অন্যান্য য়ুরোপীয় লেখকদের সংযোগ নিবিড়তর করতে। আমরা এত দূরে দূরে থাকি, চারিদিকে কী ঘটছে না ঘটেছে তার খবর এত কম রাখি।

আমার বক্তব্য শেষ করবার পূর্ব্বে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে আমি যা বলেছি তা আমারি মত, ইংরেজ প্রতিনিধিদের সমষ্টিগত মতামত নয়। দেশের পরিস্থিতি আমি যেমন ভাবে বিবৃত করেছি তাতে বোধ হয় ওঁদের আপত্তি হবে না, তবে আমার সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের মনের মতো নাও হতে পারে। তাঁরা হয় তো ভাবছেন, স্বাধীনতা ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে কথা বলা কথার অপব্যয় মাত্র

যতদিন সমাজের আর্থিক ব্যবস্থার গোড়ায় গলদ রয়েছে। তাঁরা বলতে পারেন যে আরেকবার যুদ্ধ বাধলে মিঃ অলডস্ হক্স্‌লি কিম্বা আমার মতো ব্যক্তিবাদী ও উদারপন্থী লেখকদের পাত্তাড়ি গুটোতে হবে। এটা নিশ্চিত যে আমাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে,' এবং আগামী যুদ্ধও আসন্নপ্রায়। আমার বিশ্বাস যে জাতির পর জাতি যদি রণসম্ভারে কেবলই ভাণ্ডার ভরতে থাকে তা হলে তাদের কামানবন্দুক থেকে গুলিবর্ষণ তেমনই অনিবার্য্য যেমন অনিবার্য্য নিরন্তর খাদ্যরত জন্তুর পক্ষে মলত্যাগ। অবস্থা যখন এইরূপ তখন আমার এবং আমার সমানুভব ব্যক্তিদের কাজ হচ্ছে ইতিমধ্যের কাজ। আমাদের মরচে-পড়া যন্ত্রপাতি দিয়ে টুকিটাকি এটা ওটা ক'রে যেতে হবে যতদিন না সভ্যতার ইমারত শুদ্ধ ভেঙ্গে পড়ছে। ভেঙ্গে যখন পড়বে, কিছুই আর কোনো কাজে লাগবে না, তার পরে, যদি "তার পরে" বলতে কিছু থাকে, সভ্যতার নব-অভিযানে যারা এসে যোগ দেবে, তারা নতুন শিক্ষা নতুন মন্ত্র নিয়ে আসবে।

যুদ্ধের দুর্ভাবনা নিজের মৃত্যুর দুর্ভাবনার চেয়েও আমাকে বেশি বিব্রত করে, যদিও ও দু'টো কদর্য্য ব্যাপারে আমার একই কর্ত্তব্য। দৈনন্দিনের কাজকর্ম্মে আমাকে এমন ভাব ধারণ করতে হবে যেন পরমায়ু অক্ষয় আর সভ্যতা অনন্ত। দুটি উক্তিই মিথ্যা—আমিও বেঁচে থাকব না, আমাদের এই বিপুল পৃথিবীটাও টিঁকে থাকবে না,—দুটোই সত্য ব'লে ধ'রে নিতে হবে যদি আমরা খাওয়া-দাওয়া চলাফেরা বন্ধ করতে না চাই, আর যদি মনের অন্ধকার কক্ষে দুটি একটি মুক্ত বাতায়নের প্রয়োজন বোধ করি। বক্তৃতা করা যদিও আমার পেশা নয়, তবু এই ক'টি কথা বলবার জন্য প্যারিসে আসবার ইচ্ছা সম্বরণ করতে পারি নি। বর্ত্তমান সঙ্কটের প্রতিবিধান সম্বন্ধে

মতানৈক্য যতই ঘটুক, এবং অনিবার্য্যরূপে তা ঘটবেই, নির্ভীকতার প্রয়োজন আমরা সকলেই স্বীকার করি। লেখকের মন যদি ভয়-শূন্য ও সংবেদনশীল হয় তা হলে আমার বিশ্বাস যে সাধারণের কাছে আপন কর্ত্তব্য সে পালন করেছে; আসন্ন দুর্য্যোগে মানবজাতিকে দলবদ্ধ করতে সে সহায়তা করেছে। এবং আমি এখানে বিভিন্ন দেশ থেকে সমাগত সহযাত্রীদের মধ্যে যে-নির্ভীক চিত্তের সাক্ষাৎ পাব, আমার সাহসকেও তা বলিষ্ঠ করবে।

সাহিত্যে প্রগতি

ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত

আজকাল চারিদিকে কথা উঠিতেছে যে সাহিত্যে প্রগতির প্রয়োজন। এই কথাটা কিন্তু সাধারণের নিকট হেঁয়ালির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সাহিত্যে প্রগতি অর্থাৎ অগ্রগামী গতির প্রয়োজন, এই কথার অর্থ কি? বাঙ্গলার সাহিত্যসেবীর কাছে ইহার কোন অর্থ নাই। এই জন্যই প্রগতিপন্থীদের সাহিত্যে অগ্রগামী শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে, এই তথ্যের অর্থ বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

আমাদের দেশের সাহিত্যিকেরা সাধারণত সনাতনপন্থী, অর্থাৎ সর্ব্ব বিষয়েই এই দেশের লোকের যে প্রকারের মনোবৃত্তি, এই ক্ষেত্রেও তাহা দেখা যায়। ইহার অর্থ, অতীতকে আঁকড়াইয়া থাকিয়া তাহাকেই সাহিত্যচর্চ্চার পরম লক্ষ্য মনে করা হয়। অতীতে সাহিত্যিকেরা সাহিত্যের যে রূপ দিয়েছেন, যে গণ্ডী নির্দ্দেশ করেছেন, যে ভাবধারা নির্দ্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করে গেছেন, তাহার বাহিরে যে সাহিত্যরস যাইতে পারে, এই চিন্তা এখনও এ দেশের সাহিত্যিকদের মনে সাধারণত উদয় হয় নাই। এদেশে সাধারণের নিকট এখনও সাহিত্যের অর্থ, কাব্য, নাটক ও অলঙ্কার! কিন্তু পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট অগ্রগামী জাতিদের মধ্যে 'লিটেরাটুর' (Literatur) অর্থে স্বীয় মাতৃভাষায় লিখিত যে কোন বিষয়ের

পুস্তক নির্দ্দেশ করা হয়; এই জন্য বৈজ্ঞানিক পুস্তকসমূহও বৈজ্ঞানিক 'লিটেরাটুর' বলিয়া গৃহীত হয়। অন্যদিকে, আমরা যাহাকে 'সাহিত্য' বলি, তাহাকে 'হ্যুমানিস্‌ম্' (Humanism) অর্থাৎ ক্লাসিকাল ভাষায় লিখিত পুস্তকসমূহের পাঠ মধ্যে গণ্য করা হয়। তৎপরে জীবন্ত সাহিত্যকে ঐ সব দেশে নানা স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা:—আইডিয়ালিস্‌ম্, রোমান্টিসিস্‌ম্, রিয়ালিস্‌ম্। এতদ্ব্যতীত, প্রগতিশীল লেখকেরা আবার সাহিত্য মধ্যে কৃষ্টির মাপকাঠি অনুসন্ধানের জন্য তাহাকেও প্রাচীনযুগ, সামন্ততান্ত্রিকযুগ, বুর্জোয়াযুগ, প্রলেটারিয়যুগ বলে অভিহিত করিতেছেন।

কিন্তু আমাদের দেশে, প্রথমোক্ত বিভাগটাই গণ্য হয়, শেষোক্তটি এখনও গবেষণার বস্তু হয় নাই। অতীতের ভাবধারা ও বর্ত্তমানের জাতীয়তাবাদের উন্মাদনার মধ্যে থাকিয়া ভাবুকেরা সবই একাকার দেখিতেছেন। এই সব বিষয়কে বোধগম্য করিতে হইলে সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গবেষণা প্রয়োজন।

সাহিত্য কাহাকে বলে এবং তন্মধ্যে আমরা কি দেখি, ইহাই আমাদের অনুসন্ধানের বস্তু। একটা লোকের চিন্তা, ভাবধারা ও পারিপার্শ্বিক জগতের ঘটনাসমূহ (phenomen) পর্য্যবেক্ষণ করে তাহা যখন ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তখন তাহাকে সাহিত্য বলা হয়। সাহিত্যে সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত কিছু নাই, মানবের চিন্তার ধারা তাহার বহির্জগতের অবস্থাসাপেক্ষ। ভাবের পশ্চাতে থাকে অর্থনৈতিক উপাদান। মানবসমষ্টির আর্থিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামাজিক আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন ঘটে, সেই সঙ্গে তাহার ভাবরাজ্যেও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামাজিক রূপান্তর দ্বারা কৃষ্টির যে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়, তাহার নজির হয়

ইতিহাসে, না হয় সাহিত্যে দেখিতে পাই। সাহিত্যে তৎকালীন সামাজিক চিত্র প্রতিভাত হয়, সেই জন্য সাহিত্য মধ্যে আমরা সমাজতত্ত্বের মাপকাঠি দ্বারা প্রত্যেক যুগের কৃষ্টির পরিচয় পাইতে পারি। এই জন্য সাহিত্যে সনাতনধারা বা অখণ্ড বস্তু বলিয়া কিছু নাই। জাতীয়জীবনের প্রত্যেক যুগের চিত্র আমরা সাহিত্য মধ্যে অঙ্কিত হইতে দেখি। এই জন্যই আইডিয়ালিস্‌ম্‌, রোমাণ্টিসিস্‌ম্‌ প্রভৃতি ভাগ করিলে সাহিত্যের পর্য্যাপ্ত বিশ্লেষণ হয় না; কারণ এই সব বিভাগের পশ্চাতেও ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এইজন্যই ইহা সুনিশ্চিত যে, যেমন লোকসমাজ সাহিত্যও তদ্রূপ হইবে। সাহিত্যের মধ্যেই সমাজতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। সাহিত্য আবার আর একটা বড় কাজ করে, তাহা হইতেছে ভাবপ্রচার। ইহাই সাহিত্যের "active role"। এই কারণেই সকলে স্বীয় চিন্তার ধারাকে মাতৃভাষায় লিখিয়া জনসমাজে প্রচার করিবার চেষ্টাকালীন সেই বিষয়ে একটা সাহিত্য সৃষ্টি করেন। তাই যে সমাজে যত সংঘর্ষ, সেই সমাজে ততই সাহিত্যের নানামুখী বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সাহিত্যে একটা সুরই বরাবর বাজে, বুঝিতে হইবে যে সেই সমাজ মৃতপ্রায়, তাহা অভিব্যক্তি বা আবর্ত্তনের বাহিরে গিয়া স্থাণুবৎ হইয়াছে।

সমাজে যেরূপ কোন সনাতন ধারা নাই সাহিত্যেও সেইরূপ কোন সনাতন ধারা নাই। সাহিত্য একটা নির্দ্দিষ্ট যুগ, বা সামাজিক গণ্ডী বা চিন্তাধারার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। যেস্থলে তাহা হয়, তথায় সেই মৃতপ্রায় জাতির নিদর্শন মৃতপ্রায় সাহিত্যকে আবর্জ্জনাস্তুপের মধ্যে ফেলা হয়। জাতীয় জীবনের নূতন অবস্থার প্রমাণস্বরূপই নূতন সাহিত্য গড়িয়া উঠে।

ভারতের সাহিত্যের যুগ ও ক্ষেত্র অতি প্রশস্ত; অধ্যাপক ভিণ্টারনিট্‌স্ তাঁহার "ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে বলেন যে ইহা ঋগবেদ হইতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার সময় তিন হাজার বৎসরেরও উপর। কাজেই ইহার মধ্যে নানাযুগের ও নানাভাবের লীলা-খেলা দেখা যাইবে। আপাতত সংস্কৃতের সন্তান বাঙ্গলাভাষা ছেড়ে দিয়ে আমরা কেবল বেদের ভাষাপ্রসূত সংস্কৃত ভাষা ও তাহার পালি এবং প্রাকৃত রূপে যে সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে তাহার একটা সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিব।

ব্লুমফিল্ড প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বলেন ঋগবেদ ধনী ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাদির কথাই উল্লেখ করে। ইহা দানস্তুতি, দশরাজার যুদ্ধ, ইন্দ্রের সম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, গজপৃষ্ঠে পাত্রবেষ্টিত রাজা প্রভৃতি উচ্চস্তরের লোকদের ক্রিয়াকলাপের গানে পূর্ণ। ইহাতে আর আছে "মহাকুল" ও "মঘবন" প্রভৃতিদের উল্লেখ! ইহাতেই দেখা যায় যে বেদের মন্ত্রভাগ সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের স্তুতিতেই পরিপূর্ণ। পরে, যখন প্রচলিত বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা হয় এবং সাধারণ লোকের ভাষায় ধর্ম্মপুস্তকসমূহ লিখিত হইতে থাকে, সেই সময় প্রাকৃত ও পালি ভাষায় জৈন ও বৌদ্ধাচার্য্যেরা জনসাধারণের কিঞ্চিৎ সংবাদ দিয়াছেন। এই সব পুস্তকে, সনাতনী প্রথা ভাঙ্গিয়া সংস্কারকগণ যখন শূদ্র ও পতিতদের আহ্বান করেন, তখন শ্রুতি, স্মৃতি ও ইতিহাস ভাঙ্গিয়া এক নূতন সমাজ সৃষ্ট হতে লাগিল, তাহার চিত্র আমরা জনসাধারণের ভাষায় (জাতক, অবদান ও অঙ্গাদি পুস্তক) পাই। কিন্তু যখন শেষ মৌর্য্য সম্রাটকে হত্যা করিয়া তাঁহার সেনাপতি পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণাধিপত্য

স্থাপন করে এবং যে যুগে 'মানবধর্ম্মশাস্ত্র' সৃষ্ট হয়, সেই সময় হইতে আমরা সংস্কৃত ভাষায় আর এক সামাজিক চিত্র দেখিতে পাই। ব্রাহ্মণাধিপত্যের যুগ হইতে নূতন সংস্কৃতের আদর হয়; এই আদর গুপ্তযুগে চরম শিখরে আরোহন করে। ঐতিহাসিকেরা বলেন প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার চরম উৎকর্ষ ১০০-৭০০ খৃঃ এই সময়েই হয়। সর্ব্বপ্রথমে বৌদ্ধ অশ্বঘোষ নাটক রচনা করেন; তৎপরে ভাস, কালিদাস, ভবভূতি, আরও পরে ভট্টনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণমিশ্র; শেষোক্তের সময় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তখন ভারতে মুসলমান আক্রমণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় কৃষ্ণমিশ্রের "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকে তুরস্কের নামোল্লেখ আছে।

এই যে ব্রাহ্মণদের দ্বারা বিরচিত বিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্য, যাহা লইয়া আজও আমরা গৌরব করি, তাহার স্বরূপ কি? বিশ্লেষণ দ্বারা ইহাই নিরূপিত হইবে:—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রাধান্য, কুল ও বংশের মহিমা, স্বামীধর্ম্ম, সামন্ত রাজাদের অস্তিত্ব, বাজারে শিক্ষিতা গণিকার প্রাদুর্ভাব, গোলাম শ্রেণীর অস্তিত্ব, রাজাদের অন্তঃপুরে "রঙ্গ-মহালের" অস্তিত্ব, স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা, অন্তঃপুরে কঞ্চুকী ও প্রহরী, অবগুণ্ঠনের প্রচলন, স্ত্রীলোক আইনের অধিকার হইতে বঞ্চিত (যদিচ বৈদিকযুগের পরে কুৎস স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সমানাধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করিতেন); সামাজিক etiquetteর বাহুল্য ইত্যাদি। এই সব পুস্তকে সামন্ততান্ত্রিকযুগ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পায়, সেই জন্য তাহাতে জনের ও গণের সংবাদ বিশেষ পাওয়া যায় না, কেবল রাজা, রাণী, সেনাপতি, মন্ত্রী, রাজা ও রাজকন্যার প্রণয়িণী।

এই প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিকযুগের ইতিহাসে একটা ঘটনা দ্রষ্টব্য যে, ভাস হইতে হর্ষবর্দ্ধন পর্য্যন্ত সকলেই এক ছাঁচে নিজেদের নাটক রচনা করিয়াছেন। গল্পের বেশী বাহুল্য নেই। যাহা আছে ঐতিহাসিকেরা বলেন, তাহা, সকলেই গুণাঢ্যের পৈশাচী প্রাকৃত ভাষায় লিখিত "বৃহৎ-কথা" হতে "plagiarise" করিয়া লিখিয়াছেন। এই সব পুস্তক একটা যুগের ও একটা শ্রেণীর বিষয় ক্রমাগত বর্ণনা করিয়াছে বলিয়া, সব পুস্তকই এক ছাঁচে ঢালা।

এই যুগের সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা একদিকে ব্রাহ্মণাধিপত্য ও বর্ণাশ্রমের মাহাত্ম্য (কালিদাস, ভবভূতি দ্রষ্টব্য) ও বড় বড় ক্ষত্রিয় রাজাদের গুণকীর্ত্তনে ব্যস্ত থাকায় দেখি যে, ব্রাহ্মণ লেখকগণ সাধারণকে ধাঁধাঁ লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে হিন্দুসমাজ চিরকালই সনাতনী ও ব্রাহ্মণবাদ মানিয়া লইয়াছে, অন্যদিকে সংবাদ পাই যে "লোকায়তবাদ", নাস্তিকতা, বাস্তবিকতা ও সুখভোগবাদ প্রচার করিতেছে। এই মতে বিশ্বাসীর দল ছিল ধনকুবের "নাগরক"গণ। প্রাচীন হিন্দুর সুখসমৃদ্ধির কালে যখন নানা সমুদ্র বহন করে হিন্দুর অর্ণবপোতগুলি নানাদেশ হইতে "সুক্তার বদলে মুক্তা, জিরের বদলে হীরে" লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিত তখন এই অর্ণবপোতদের মালিকদের মধ্যে "নাগরক" শ্রেণী উদ্ভূত হয়। বাৎসায়ণ বলেন এই নাগরকগণই লোকায়ত ধর্ম্মের অনুরাগী হয়। "বনে দুইটা ময়ূরের অনুসন্ধানাপেক্ষা হাতে একটা পাখী থাকা ভাল," ইহাই হইতেছে লোকায়তদের মত। আসল কথা, দেশে ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সামন্ততন্ত্রীয় আভিজাত্যের পার্শ্বে একটা বুর্জোয়া শ্রেণী বিবর্ত্তিত হয়। এই শ্রেণীর নাগরকগণ পাশ্চাত্য দেশের হালফ্যাশানের ধনকুবেরগণের ন্যায় জীবন যাপন করিত। প্যারিস শহরে যে 'type' কে

"boulevardier" বলা হয়, প্রাচীন ভারতের নাগরকগণ তাহাদেরই প্রতিমূর্ত্তি! ভাস ও মৃচ্ছকটিক নাটকের চারুদত্ত তাহারই একজন প্রতীক, যদিচ ধনহীন। এক কথায়, সামাজিক উচ্চস্তরে অবস্থিত অভিজাত শ্রেণীর লোক যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ও বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের গুণ কীর্ত্তন করিত, ধনকুবের নাগরকগণ Realist হয়ে নাস্তিকতা ও ভোগবাদ মতের পোষকতা করিত। এই জন্যই তারা বৃহস্পতি ও চার্ব্বাকের লোকায়ত মতের অনুরাগী হয়। আবার, এই সময়ে গণের সন্ধান পাই, বৌদ্ধ অবদান ও অন্যান্য ধর্ম্মপুস্তকে। তাহারা সাম্যবাদী বৌদ্ধ ধর্ম্মে অনুরাগী হয়।

যখন ভারতীয় সমাজ এই ভাবে চলিতেছে, তখন আমরা হিন্দু সমৃদ্ধির শেষাশেষি তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রাতুর্ভাব ভারতে দেখিতে পাই। তান্ত্রিক ধর্ম্ম সামাজিক হিসাবে বর্ণাশ্রমের বিপক্ষে যায় নাই। সেই জন্য আমরা সাহিত্যে ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে তান্ত্রিকতার সব অলৌকিক গল্পের অবতারণা হতে দেখি। রাজশেখরের "বিদ্ধশাল ভঞ্জিকা" হইতে ভবভূতির "মালতীমাধব" নাটকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মালতীমাধব নাটকে কাপালিক অঘোরঘণ্টা ও তাহার শিষ্যা কপাল-কুণ্ডলার বীভৎস ব্যাপার বর্ণিত আছে। "কাপালিক দেবীর নিকট স্ত্রীরত্ন উপহার দিবার জন্য অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কপালকুণ্ডলা তাহারই আহরণের ইচ্ছা করিতেছিলেন" (ভবভূতি, কবিকথা ২ খণ্ড পৃঃ ৪৭৮)।

এই প্রকারে সংস্কৃত সাহিত্যে বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন শ্রেণীর চিত্র বর্ণিত হইতে দেখি। শেষে একটি পুস্তকের বিষয় উল্লেখ করে এই অধ্যায় সমাপ্ত করিব। তাহা হইতেছে পূর্ব্বোক্ত প্রবোধ

চন্দ্রোদয় নাটক। ইহা ধর্ম্মাত্মক পুস্তক, রূপকভাবে লিখিত এবং ইহাতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বাঙ্গালায় যখন বৌদ্ধ শাসন অন্তর্হিত হইয়া ব্রাহ্মণ্যবাদীয় শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা একটা বাঙ্গালী national-chauvinist ভাব সৃষ্ট হয়েছে (এইভাব দশম শতাব্দীর ভবদেব ভট্টেও দৃষ্ট হয়) তখন এই নাটক লিখিত হইয়াছে বলিয়া আমার অনুমান হয়। জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের অনুবাদ হইতে উদ্ধৃতাংশটি পাঠ করিলেই তাহা বোধগম্য হবে।

"অহংকার—(সক্রোধে) আরে, আমরা দেখচি তুরস্কদেশে এসেছি; তা না হলে অতিথি ব্রাহ্মণকেও গৃহস্থেরা পাদপ্রক্ষালনের জল দেয় না" (পৃঃ ২১)

* * *

"অহংকার—অত্যুত্তম রাজ্য এক, গৌড় তার নাম
তাহারি গো রাঢ়দেশে ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রাম;
সে গ্রামে করেন বাস শ্রেষ্ঠ মোর পিতা,

* * *

তার মাঝে সর্ব্বোত্তম জানিবে আমারে
প্রজ্ঞাশীল বুদ্ধি ধৈর্য্যে বিনয় আচারে"। (পৃঃ২২)

ইহা বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণাধিপত্যের যুগের অর্থাৎ ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় সেন রাজাদের সমসাময়িক কালের জাঁকের কথা! ইহা পুষ্যমিত্র প্রতিষ্ঠিত Brahmanical Imperialism রূপ ব্যবস্থা বাঙ্গালায় সংস্থাপিত হইবার পর, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণের জাঁকের বড়াই। তারপর, তুরস্কের শেল বাঙ্গালায় পড়ে, ব্রাহ্মণ তখন গৌড়দেশের জাঁক

করে না, করে কেবল নিজের বর্ণের ও বংশের! তারপর আসে দেবীবরের মেলবন্ধনের পালা, আর রঘুনন্দনের সতীদাহ ও আচারের কড়াকড়ির ব্যবস্থা। এই প্রকারে আমরা দেখি যে, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও শ্রেণী সংগ্রামের ছাপ রহিয়াছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্ত্তনের সঙ্গে ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

এইবার আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের কিঞ্চিৎ সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করিব। বাঙ্গালা সাহিত্য প্রায় ১০০০ বৎসরের। গৌড় প্রাকৃত নানা অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে বাঙ্গালা ভাষার আকার আসিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় হালফ্যাসানের ঐতিহাসিকেরা বাঙ্গালার সঠিক ইতিহাস খৃঃ ৭ম শতকের শশাঙ্ক ও নরেন্দ্র গুপ্ত হইতে আরম্ভ করেন। হালে আবিষ্কৃত একজন বৌদ্ধ বাঙ্গালী দ্বারা বিরচিত "আর্য্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্পে" লিখিত আছে যে শশাঙ্ক ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন। তৎপরে অরাজকতার জন্য প্রজারা ভদ্র নামক একজন শূদ্রকে রাজপদে বরণ করেন। তৎপর একটী republic স্থাপিত হয়। বাঙ্গালা আবার "মাৎস্যন্যায়" দ্বারা জর্জ্জরিত হইলে প্রকৃতিপুঞ্জ গোপাল নামক একজন নায়ককে রাজপদে বরণ করেন। উপরোক্ত পুস্তক গোপালের জাতি সম্বন্ধে বলিতেছে যে ইনি "দাস জীবিন্", অর্থাৎ, ইনি অতি নীচ শ্রেণীর শূদ্র। এই গোপালই বিখ্যাত পালবংশের স্থাপয়িতা। এই সময়ে বাঙ্গালার রাজারা কিছুকালের জন্য উত্তর ভারতে সার্ব্বভৌমত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহারা "পঞ্চ গৌড়েশ্বর" আখ্যা পান। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে এহেন প্রবল পাল-যুগের কোন নিদর্শন নাই। আছে কেবল ছড়া বা গীতিতে। তাহারও অতি যৎসামান্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরের যুগের ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালীর

শৌর্য্যবীর্য্যের ও গুণগরিমার চিহ্ন একেবারে মুছিয়া দিয়াছে। এখন "ধান ভান্‌তে মহীপালের গীত" পরিবর্ত্তে শিবের গীত গাওয়া হয়। চৈতন্যচরিতামৃতে দুঃখের সহিত বলা হইয়াছে, "জোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত, শুনে সব লোকে আনন্দিত।"

পরলোকগত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত এই যে বাংলায় বৌদ্ধ কৃষ্টির সমস্ত চিহ্নই ব্রাহ্মণেরা বিলুপ্ত বা রূপান্তরিত করিয়াছেন। হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাংলা যে বৌদ্ধ-প্রধান দেশ ছিল তাহার কোন চিহ্ন আজ নাই। ইহা হইতেছে ভীষণ শ্রেণী-সংগ্রামের একটী নির্ম্মম দৃষ্টান্ত। দশম শতাব্দীতে এই সংগ্রাম ধর্ম্ম-সংগ্রামরূপে প্রকাশ পায়। বাংলার ছড়া "আগ্‌ডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে···সাজতে সাজতে পড়ল সাড়া, সাড়া গেল বামুন পাড়া" সেই সংগ্রামের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিতেছে। এই সময়ের ইতিহাসে বৌদ্ধদলন দেখিতে পাওয়া যায়। রাঢ় দেশের শূরেরা এবং পূর্ব্ববঙ্গের বর্ম্মণেরা বিদেশাগত এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী। তাহারা বাঙালীর গলায় লৌহশৃঙ্খল পরাইতে আরম্ভ করে। পরে কর্ণাটাগত সেনেরা তাহা সম্পূর্ণ করে। এই সময় হইতে একদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদী-দিগের অত্যাচার, অন্যদিকে বৌদ্ধ বাঙালীদের বিক্ষোভ,—এই দুই অবস্থা সম্মিলিত হইয়া মুসলমান-তুর্কীদিগের দ্বারা বাংলা বিজয় সহজ করিয়া দেয়। এই যুগে বাংলা সাহিত্যের যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, "সূর্য্যের পাঁচালী" "শূন্য-পুরাণ" ও ধর্ম্ম-পুরাণ" ইত্যাদি—তাহাতে আমরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী গণশ্রেণীর সংবাদ পাই। এই ধর্ম্মমঙ্গলই বাংলার epic বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। ইহাতে ধর্ম্মঠাকুরের ভক্ত লাউসেনের যুদ্ধ বিবরণ আছে। ইহাতে আমরা সংবাদ পাই

যে সম্রাট ধর্ম্মপালের শ্যালিকাপুত্র কামরূপ-বিজয়ী লাউসেনের দক্ষিণ হস্ত ছিল কালু ডোম। এই মহাকাব্যে দেখি ডোম সেনাপতি ইন্দ্রমেটে গৌড়ের সহর কোটাল, একজন চণ্ডাল চেকুরের সহর কোটাল আর চেকুরের ইছাই ঘোষ সম্ভবতঃ গোয়ালা। আর্য্য মঞ্জুশ্রী কথিত পালরাজাদের জাতি এবং তাহাদের সামন্ত ও কর্ম্মচারীদের জাতি দেখিয়া তৎকালীন বাংলার সমাজের স্বরূপ কিঞ্চিৎ বোঝা যায়। আজ যাহারা অধঃপতিত সেই সময়ে তাহারাই উচ্চবর্ণের ও শাসক শ্রেণী ছিলেন। এই যে বাংলার সামাজিক পট সেনযুগ হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকার গ্রহণ করিয়াছে সেই নির্ম্মমতার কোন স্মৃতিই বাংলা সাহিত্যে নাই। তৎপরে ব্রাহ্মণ যুগে আমরা উচ্চশ্রেণীর শৈব ধর্ম্ম ও গণশ্রেণীদের ধর্ম্মের সংগ্রাম "মনসার ভাসান" পুস্তকে দেখিতে পাই।

ঐতিহাসিকেরা বলেন যে বাংলার পালেরা মহাযানী বৌদ্ধ ছিলেন এবং মহাযানী বৌদ্ধধর্ম্ম তান্ত্রিক ও শৈব ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল। এই জন্যই বাংলার আভিজাতবর্গ হয় মহাযানী, নয় তান্ত্রিক ছিল। আর গণসাধারণ হীনযান, সহজযান, নাথধর্ম্ম ও অন্যান্য পন্থাবলম্বী ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রচলনের সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় যে উচ্চশ্রেণীরা হয় তান্ত্রিক, নয় শাক্ত, এবং তাহাদের সহিত গণসাধারণের ধর্ম্মের সংঘর্ষ হইতেছে। মনসা-পূজার পুস্তকে তাহা ভাল ভাবে দেখা যায়। মহেনজোদাড়োতে যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তাহাতে দেখা যায় যে ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বেও সাধারণ লোকে অশ্বত্থ গাছ, নানা প্রকারের জন্তু ও লিঙ্গ পূজা (phallic worship) করিত; এই ধর্ম্ম আজ

পর্য্যন্ত অন্তঃসলিলার ন্যায় ভারতে চলিতেছে। ইহারই উপর বৈদিক ধর্ম্ম আরোপিত করা হয়। কিন্তু বাঙ্গালার অভিজাত ব্রাহ্মণ্যবাদের সহিত ইহার ঠিক রফা হয় নাই; তাই মনসার ভাসানে দেখি ধনী চাঁদসদাগর বলিতেছে :—

"যে হাতেতে পূজি আমি দেব শূলপাণি
সে হাতে পূজিব আমি কাণিচ্যাঙ্গমুড়ি" !

এই সব পাঁচালীর মধ্য দিয়া আমরা গণশ্রেণীর সংবাদ পাই। এই সময়ের সেনরাজাদের যুগে ও তথাকথিত পাঠানযুগে ব্রাহ্মণ দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্য পরিস্ফুট হইতে দেখি না। ঐতিহাসিকেরা বলেন মুসলমান রাজারা বাঙ্গালা সাহিত্যের স্রষ্টা। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা গৌড় প্রাকৃতকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তৎপরে আসে মোগল-শাসনের প্রাক্কালে কবিকঙ্কণের চণ্ডী। মোগলশাসনের প্রচলন সহিত বাঙ্গালায় রাজনীতি ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের যুগ শেষ হইয়া যায়।

মোগলেরা ভারতে কেন্দ্রীভূত শাসনপ্রণালী প্রচলন করেন। এই সময় হইতে বাঙ্গালায় যাঁহারা জমিদার আখ্যা পাইতেন, তাঁহারা দুর্গবাসী সামন্তরাজাও নহেন বা Manor নিবাসী ব্যারণও নহেন। তাঁহারা কেবল খাজনা আদায় করিবার চুক্তিবদ্ধ কর্ম্মচারী। পরবর্ত্তীকালের সাহিত্য আলোচনাকালে এই কথাটি আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। কবিকঙ্কণের চণ্ডী তৎকালীন বাঙ্গালায় একটী realistic চিত্র দিয়াছে; তাহাতে নিখুঁতভাবে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক-চিত্র পাওয়া যায়। ইহাতে পাই দরিদ্রগণের সংবাদ—বারমাস "অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তাতে।" কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে যদিও বাঙ্গালায় সামন্ততন্ত্রের অবসান হইয়াছিল, তবুও

সেই প্রাচীনযুগ হইতে সংস্কৃতসাহিত্যে পণ্ডিতেরা যে খাত কাটিয়া দিয়াছেন তাহার মধ্য দিয়া কবিকঙ্কণের চণ্ডীও প্রবাহিত হয়। সেই জন্য যেমন একদিকে ব্রাহ্মণ্য আদর্শের বিপক্ষাচরণ করিয়া চণ্ডীর মহিমা বাড়াইবার জন্য একজন অস্পৃশ্য ব্যাধকে রাজা সাজাইয়াছেন, তেমনই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ভাবধারা ধরিয়া কলিঙ্গ রাজাকেও খাড়া করিয়াছেন, আর কালকেতু হইয়াছে তাঁহার সামন্তরাজা! কবিকঙ্কণ এত "realist" ছিলেন যে চণ্ডীর কাছে পশুদের আক্ষেপ মধ্য দিয়ে তৎকালের বাঙ্গালার রাজনৈতিক সামাজিকচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যিকদের মোহে পড়িয়া ব্যাধ কালকেতুকে সামন্তরাজা সাজিয়েছেন এবং বৃদ্ধকালে স্ত্রীর পরামর্শে প্রাণের ভয়ে ধানের মরাইয়ের মধ্যে লুক্কায়িত করাইয়াছেন। কালকেতুকে একজন অজেয় বাঙ্গালী বীর না সাজাইয়া এই শেষের চিত্র কি তৎকালের বাঙ্গালী যোদ্ধার realistic ছবি হইয়াছে?

মুকুন্দরামের পরে, বড় বাঙ্গালী কবি, ভারতচন্দ্র। সাহিত্যিকেরা বলেন, তাঁহার "বিদ্যাসুন্দর" প্রাচীন পুস্তকের নূতন সংকলন। ইহাতেও আমরা সেই প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের ছাপ দেখিতে পাই। অবশ্য তাহাতে তৎকালীন মুসলমান-দরবারী ছাপ মিশ্রিত আছে। ভারতচন্দ্র প্রতাপাদিত্যকে বড় করিয়া দেখাইয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে সেই সময়ের ঐতিহাসিক সংবাদও যৎকিঞ্চিৎ দিয়াছেন। আর দেখিয়েছেন সেই যুগের হিন্দুর "defeatist mentality"; তাই কবি বলিতেছেন:

পাতসাহি ঠাটে কবে কেবা আঁটে

* * *

বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া, প্রতাপাদিত্য হারে।"

লক্ষ্য করার কথা এই যে, এই যুগের সাহিত্যিকেরা বাঙ্গলা ভাষায় একটা স্বতন্ত্র সাহিত্য রচনা করিলেও সেই প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যিকদের পাশমুক্ত হতে তাঁহারা পারেন নাই। তাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের অলঙ্কার বাঙ্গলায় চালাইতেছিলেন, তাই ভারতচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের সহিত মোগলদের যুদ্ধে সৈন্যেরা "মুচড়িয়া গোঁফে শূল শেল লোফে" বলিয়াছেন। আর একজন সাহিত্যিক সংস্কৃতে প্রতাপাদিত্যের জীবনী রচনাকালে "চন্দ্রবাণ, বায়ুবাণ" প্রভৃতি উল্লেখ করিয়াছেন। এই কালের মাণিক গাঙ্গুলী তাঁহার ধর্ম্মপুরাণে লাউসেনের কীর্ত্তি গাইতে গিয়া সংস্কৃত মহাভারতের ঢং তাহাতে ঢুকিয়েছেন! এতদ্বারা একদিকে যেমন চিন্তাশক্তির অনুর্ব্বরতার পরিচয় প্রদান করে, অন্যদিকে সনাতন ধারাকে অক্ষুন্ন রাখবার চেষ্টাও এই সব ব্রাহ্মণ লেখকদের মধ্যে ছিল বলিয়া অনুমান হয়। তাঁহারা এই জন্যই জার্ম্মাণ সমাজতাত্ত্বিক Oswald Spengler বলেন যে গ্রীক, হিন্দু প্রভৃতি প্রাচীনেরা space and time অগ্রাহ্য করে চলেছিলেন।

ভারতচন্দ্রের পর, ইংরেজ শাসনের যুগ আরম্ভ হয়। এই যুগে একটা মধ্যবিত্তশ্রেণী উদ্ভূত হয়। বাঙ্গলার সমাজের সর্ব্ববিষয়ের কর্ত্তৃত্ব এই শ্রেণী দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু উপরোক্ত দোষ জন্য ঊনবিংশ শতাব্দির বাঙ্গালী সাহিত্যিকেরাও সামন্ততান্ত্রিক যুগের মোহ কাটাইতে পারেন নাই। তাই এই যুগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের নায়কেরা কেহ হয়ত ভূস্বামী, যিনি কেল্লার ভিতর থাকেন, এবং তাঁহার অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকেরা কক্ষ, গবাক্ষ ও আম্রকাননে 'সখী সংবাদ' করছেন, না হয় তিনি একজন তাহার substitute জমিদার, যিনি বলেন, "আমার কাছে পুলিশ ম্যাজিষ্টর কি?"

আমিই পুলিশ, আমিই জজ ম্যাজিষ্টর"! এই যুগের লেখকেরা ভুলে যান যে বর্ত্তমান কালের বুর্জ্জোয়া অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী বা মোগল আমলের ভূস্বামীর স্থান আর নাই, আর আজকালকার জমিদারেরা ইংরেজের জন্য প্রজার কাছে খাজনা আদায়কারী এজেন্ট মাত্র।

এই প্রকারে বর্ত্তমানের বাংলা সাহিত্যে একটা anachronism (কাল-ব্যতিক্রম) রয়েছে। আমরা আছি একযুগে, কিন্তু সাহিত্যের চিত্র হইতেছে আর এক যুগের! ইহা সত্য বটে যে, ভারতীয় সমাজ সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এখনও প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু ইংরেজ শাসনের জন্য এবং কলকারখানার জন্য যে মধ্যশ্রেণী বা বুর্জ্জোয়াশ্রেণী সর্ব্বত্র উদ্ভূত হইয়াছে এবং যাহারা ভারত শাসনে ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহাদের অস্তিত্বের চিহ্ন আমাদের সাহিত্যে কোথায়? তৎপর, আজকাল যে ভারতের সর্ব্বত্র শ্রমিক ও কৃষক জাগরণ হইতেছে, তাহারাই যে স্বরাজ-শাসনের ভার লইবার অধিকারী বলিয়া দাবী করিতেছে তাহারও নিদর্শন সাহিত্যে কৈ? ইহার বদলে আমরা দেখি যে হঠাৎ মাথায় টিকি ও এক হাতে মনু ও রঘুনন্দন, আর অন্য হাতে কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চুক্তিপত্র নিয়ে লোকসমাজে আবির্ভূত হয়েছেন "বিপ্রদাস"! সমগ্র ভারতে আজ গণশক্তির জাগরণ, সর্ব্বত্র কায়েমী স্বার্থ (vested interests) উঠিয়ে দেবার কথা ও আন্দোলন চলিতেছে, সাম্য-স্থাপনের কথা উঠিতেছে, এমন সময়ে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য ও জমিদারের উচ্চ আদর্শ দেখাইবার জন্য এই commercial ও industrial যুগে বিপ্রদাসের আক্রমণের রাজনীতিক চালবাজী অনেকের নিকট ঢাকা থাকে নাই! আমরা জানি বনিয়াদী বা কায়েমী স্বার্থ নিজেদের

অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য বড় বড় অধ্যাপক দিয়ে প্রচার কার্য্য চালাইতেছে, সেই জন্য এই যুগে বিপ্রদাস একাধারে ব্রাহ্মণ ও জমিদাররূপে আবির্ভূত হইয়া এই দুই বনিয়াদী স্বার্থের পক্ষে ওকালতী করাতে আমরা আশ্চর্য্য হই নাই, যদিচ ইহাও বাঙ্গলা সাহিত্যের anachronismএর আর একটি প্রমাণ। আমরা বিপ্রদাসকে শ্রেণী-সংগ্রামেরই প্রতীক বলিয়া গণ্য করি, আর সাহিত্যকে এইরূপ ব্যবহার করার উপায় ফ্যাশিষ্ট দেশ সমূহেও গৃহীত হইতেছে।

এইরূপে আমরা দেখি যে বুর্জ্জোয়াযুগে বাংলায় একটা বুর্জ্জোয়া সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে না। তবে আজকালকার অনেক লেখক মধ্যবিত্তশ্রেণীয় নায়ক ও নায়িকাকে কেন্দ্র করিয়া নভেল নাটক লিখিতেছেন। কিন্তু কেবল মধ্যশ্রেণীয় নায়ক ও নায়িকার গল্প নিয়ে একটা বুর্জ্জোয়া সাহিত্য গড়িয়া উঠে না। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী ও আমেরিকার সাহিত্যকে যেমন আমরা সম্পূর্ণরূপে বুর্জ্জোয়া সাহিত্য বলিয়া গণ্য করিতে পারি, সেই প্রকারে সামন্ততন্ত্রী যুগের প্রভাব হইতে বিমুক্ত হইয়া মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক ও তাহার কৃষ্টিকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য গড়ে উঠে তাহাকেই বুর্জ্জোয়া সাহিত্য বলে। রোমাঁ রোলাঁর ও জোলার পুস্তকসমূহ, আমেরিকায় এমার্সন, হুইটিয়ার, লংফেলো, ওয়াল্ট হুইটম্যান প্রভৃতি এই সাহিত্যিকযুগের প্রতীক। সমাজ সম্পূর্ণরূপে মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বার্থোদ্দেশে চালিত হইলে সেই সমাজের সাহিত্যও নিজের নূতন খাত সৃষ্টি করিবে।

অবশ্য বাংলার সমাজ এখনও সম্পূর্ণভাবে "বুর্জ্জোয়াত্ব" প্রাপ্ত হয় নাই, সেইজন্য আমরা একটা খাঁটি বুর্জ্জোয়া সাহিত্য এখনও উদ্ভূত হইতে দেখি না। কিন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণীর কাহিনী নিয়ে যে সাহিত্য

গড়িয়া উঠিতেছে তাহা এখনও প্রাচীনের প্রভাব কাটিয়া উঠিতে পারে নাই। বুর্জোয়া সাহিত্যে সাধারণত আমরা আধুনিক লোকের চরিত্র অঙ্কিত হইতে দেখি। তাহারা প্রাচীনের মোহ কাটাইয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৌশলে জগতের ধনসম্পদ ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত! এই জন্য প্রাচীন আইন, বিধিনিষেধ, সমাজ-বন্ধন ছেদ করে সমাজকে নূতন ছাঁচে গড়িতে চায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমেরিকা, ফ্রান্স, কেমালের তুর্কি প্রভৃতি। কিন্তু আমাদের হালের সাহিত্যে সামাজিক আবর্ত্তনের সেই সুর কোথায়? তাই "পণরক্ষার" মধ্যে দেখি যে নায়ক যৌবনে সমাজ সংস্কার কর্ম্মে উৎসাহ প্রকাশ করিলেও যখন তাঁহার "তেতালা বাড়ী হইল" তখন "কোন মতে পারিবারিক পূর্ব্ব ইতিহাসের এই অধ্যায়টাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া সমাজে উঠিবার জন্য তাঁর রোখ চাপিয়া উঠিল। নিজের মেয়েটিকে সমাজে বিবাহ দিবেন এই তাঁর জেদ···শিক্ষিত সৎ পাত্র না হইলেও চলে, কন্যার চিরজীবনের সুখ বলিদান দিয়াও তিনি সমাজ দেবতার প্রসাদ লাভের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন"। আবার, "হালদার গোষ্ঠী" পুস্তকে পড়ি—"বড় ঘরের দাবী কি সামান্য দাবী! তাহার যে নিষ্ঠুর হইবার অধিকার আছে। তাহার কাছে কোনো তরুণী স্ত্রীর কিংবা কোনো দুঃখী কৈবর্ত্তের সুখ দুঃখের কতটুকুই বা মূল্য!" ইহাতে আমরা সেই পুরাতন সামন্তযুগেরই প্রতিধ্বনি শুনি। আবার "চোখের বালি"র মধ্যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ঘরের কথা পাই, "এডিপুস কম্‌প্লেক্স" তথায় বিরাজ করিতেছে। তাহার অনুসরণ ও পশ্চাৎ অনুসরণের পর, victim (বলি) বিনোদিনী বলিতেছে, "ছি ছি, একথা মনে করিতে লজ্জা হয়। আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে

লাঞ্ছিত করিব, এ-কথন হইতে পারেনা! ছি, ছি, একথা-তুমি মুখে আনিওনা।" আবার সে বলিতেছে, "কিন্তু ছি, ছি, বিধবাকে তুমি বিবাহ করিবে! তোমার ঔদার্য্যে সব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি অকাজ করি—তোমাকে সমাজে নষ্ট করি, তবে ইহজীবনে আমি আর মাথা তুলিতে পারিব না।" এই পুস্তকে এডিপুসের victim স্ত্রীলোক হল কাশীবাসিনী আর পুরুষ গোঁফে চাড়া দিয়ে সমাজে মাননীয় হইয়া রহিল! এই নভেলেও পুরুষ-প্রাধান্যযুক্ত সমাজের (androcentric theory of society) ছবি প্রদত্ত হইয়াছে, যদিচ এই পুস্তকের যুগেই নরতাত্ত্বিক ও জীব-তাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিকগণ স্ত্রীলোক ও পুরুষের সমানাধিকারের তথ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন!

এই প্রকারে দেখি যে, আমাদের হালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকেরা মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবন অঙ্কিত করিতে যাইয়া সনাতনী খাতে গিয়ে নিমজ্জিত হইতেছেন। এখনও বাংলার বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে প্রাচীন "অবধূত-গীতা" ও শঙ্করাচার্য্যের স্তোত্র "কা নরকস্য দ্বারং নারী" মতটা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তবে হালে যে এক প্রকার নূতন সাহিত্যের উদয় হইয়াছে, তাহা একটা বুর্জোয়া সাহিত্যের অভিমুখে যাইতেছে মনে হয়। কিন্তু ইহা যেন কেবল "এডিপুস কম্প্লেক্সের" অনুসরণ করেই পরিশ্রান্ত হইতেছে। ইহাতে সমাজকে আধুনিক ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার কোন আদর্শই প্রদত্ত হইতেছে না। ইহাতে জনের সন্ধান বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না—গণের তো নয়-ই। কেবল পাওয়া যায় যৌন-সম্বন্ধের কাহিনী। কিন্তু যৌন-সম্বন্ধই সমাজের একমাত্র অনুষ্ঠান নয়। এই সাহিত্যে সমাজের বর্ত্তমান সমস্যাগুলির আলোচনা হইতেছে না। অনুমান

হয় এক প্রকারের ইউরোপীয় ভাবধারা বাঙ্গালী সমাজে আরোপিত করিয়া একটা অস্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা গঠন করা হইতেছে। যৌন সম্বন্ধের শুধু বিচার করিলেই পুরুষ ও নারীর শেষ প্রশ্নের সমাধা হয় না। আবার নারীর ক্রমাগত স্বামী বা প্রণয়ী পরিবর্ত্তন করাই তাহার সামাজিক "শেষ প্রশ্ন" নয়। ইহা কোন্ সমাজের আদর্শ তাহা জানি না, অন্তত সাম্যবাদী গণশ্রেণী সমাজে তাহা নয় ইহা নিশ্চিতভাবে জানি। এইজন্য এই সাহিত্যকে পূর্ণভাবে বুর্জোয়া সাহিত্য বলা যাইতে পারে না। খুব সম্প্রতি আসিয়াছে একটী নূতন ধরণের সাহিত্য,—তাহা গণশ্রেণীর জীবনের বৃত্তান্ত আলোচনা করে। এই বিষয়ে দু'একটী সুন্দর পুস্তিকাও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে একটু "realistic" ছাপ আছে, কিন্তু ইহাকে গণসাহিত্য বলা যায় না। পুস্তকে গণশ্রেণীর জীবন সম্বন্ধে লিখিলেই তাহা গণসাহিত্য হয়না।

গণশ্রেণীর দুঃখ ও দারিদ্র্য, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের কথা, হৃদয়ের বেদনা ও সুখেচ্ছার কথা লইয়া এবং তাহাকে সমাজের কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার world-view নিয়ে যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে তাহাকে গণসাহিত্য বলা যায়। ভারতে অর্থনৈতিক কারণে একটা গণ-আন্দোলন চলিতেছে বটে, কিন্তু তাহার একটা সাহিত্য এখনও গড়িয়া উঠিতেছে না—ইহাও একটা কাল-ব্যতিক্রম। যেদিন গণশ্রেণীর লোক সাহিত্যে লোকসমাজের চিত্র অঙ্কিত করিবে, সেইদিন একটা জীবন্ত গণসাহিত্য উদ্ভূত হইবে।

আমাদের সাহিত্যের পরিস্থিতির কথা যৎসামান্য আলোচনা করা গেল। মোটের উপর দেখি যে আমাদের সাহিত্যে একদিকে সনাতনী খাত প্রবাহিত হইতেছে, অন্যদিকে অদ্ভুত বৈদেশিকভাব

আসিতেছে। আমার মতে উভয়ই বেখাপ্পা। আমাদের সাহিত্যে "realism"-এর অত্যন্ত অভাব রহিয়াছে। আমরা "space and time"কে ঠিকভাবে ধরিয়া চলিতেছি না। তাই একদল নূতন শ্রেণীর লেখকের প্রয়োজন, যাঁহারা বিভিন্ন স্তরের যথার্থ অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন ও পরিবেষণ করিবেন, যাঁহারা সমাজ ও সাহিত্যকে সনাতন গণ্ডী হইতে বাহির করিবেন এবং কালব্যতিক্রমের অসামঞ্জস্যের কবল হইতে রক্ষা করিবেন। সাহিত্যে প্রগতি আনিতে হইলে এগুলির বিশেষ প্রয়োজন। যাহাতে সমাজ যথার্থই অগ্রগতিশীল হয়, তাহাই প্রগতি লেখকদের লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন।

ভারতে ইংরেজ শাসন

কার্ল মার্ক্‌স্‌

[হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত]

* ১৮৫২ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে "নিউইয়র্ক ট্রিবিউন" পত্রে মার্ক্‌সের অনেকগুলি লেখা প্রকাশ হয়। যে দুটী প্রবন্ধের অনুবাদ দেওয়া গেল, সেগুলি ২৫শে জুন, ১৮৫৩, আর ৮ই অগষ্ট, ১৮৫৩ তারিখে প্রকাশ হয়েছিল। ভারতের জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের সাহিত্যিকরা এখন আর উদাসীন থাকতে পারেন না। এ বিষয়ে মার্ক্‌সের গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে আমাদের লেখকদের পরিচিত করে দেওয়াই এই অনুবাদের উদ্দেশ্য। *

এক

হিন্দুস্থান এশিয়ার ইতালী; হিমালয় তার আল্‌প্‌স, বাংলার সমভূমি তার লম্বার্ডি, বিন্ধ্যগিরিশ্রেণী তার অ্যাপেনাইন্‌স্‌, সিংহল-দ্বীপ তার সিসিলি। দুই দেশেই আছে শস্যের উর্ব্বর বৈচিত্র্য আর রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার পার্থক্য। দুই দেশই বহুদিন থেকে বিদেশী আক্রমণের চাপে অঙ্গচ্ছেদ সহ্য করে এসেছে। আবার সমাজের দিক থেকে দেখতে গেলে হিন্দুস্থান প্রাচ্যের ইতালী নয়, প্রাচ্যের আয়ারলণ্ড। তাই ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্মানুষ্ঠানে ভোগাসক্তি ও বিষাদের, ইতালী ও আয়ারলণ্ডের অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। সে ধর্ম্মানুষ্ঠানে আছে ইন্দ্রিয়বৃত্তির আতিশয্য আর সন্ন্যাসিদের আত্মনিগ্রহ, আছে লিঙ্গ আর জগন্নাথ, আছে যোগী আর দেবদাসী।

ভারতবর্ষের সত্যযুগে যাদের আস্থা আছে, তাদের মতে আমি সায় দিইনা। আমার স্বপক্ষে সার চার্লস্ উডের মত কুলী থাঁর বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই। আওরংজেবের রাজত্ব, বা উত্তরে মোগল ও দক্ষিণে পর্ত্তুগীজদের আক্রমণকাল, বা মুসলমান আক্রমণের যুগ বা দক্ষিণভারতে সপ্তরাজ্যের সময়, কিম্বা খ্রীষ্টান মতে পৃথিবীসৃষ্টির পূর্ব্বেও যে যুগে ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা ভারতের দুঃখকাহিনীর আরম্ভ বলে প্রচার করেছেন,—কোথাওই সত্যযুগের সন্ধান মেলে না।

কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে ইংরেজ রাজত্বে ভারতবর্ষের যে দুর্গতি হয়েছে, তা পূর্ব্বের তুলনায় শুধু বিভিন্ন প্রকৃতির নয়, বহুগুণ তীক্ষ্ণ ও তীব্রও বটে। এর কারণ কেবল এশিয়ার আর ইয়োরোপের স্বেচ্ছাচার-তন্ত্রের দানবীয় সংযোজন নয়; ঐ সংযোজন ইংরেজ শাসনের বিশেষত্ব নয়, ওলন্দাজ শাসনের অনুকরণ মাত্র। তাই ইংরেজ ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যকলাপ বোঝাতে গেলে পুরাণো ওলন্দাজ ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী সম্বন্ধে জাভার ইংরেজ গবর্ণর স্যার ষ্ট্যাম্ফর্ড র‍্যাফ্‌ল্‌সের কথা হুবহু তুলে দেওয়া চলে:—

"ওলন্দাজ কোম্পানীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল লাভ। তারা প্রজাদের উৎপীড়ন করত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের কুঠিওয়ালাদের চেয়ে বেশী, কারণ পয়সা দিয়ে কেনা মজুরদের একটু যত্ন না নিলে কুঠিওয়ালাদেরই লোকসান হত। প্রজাদের শেষ আধলা পর্য্যন্ত ওলন্দাজ কোম্পানী আদায় করত; রাজনীতিকের কূটবুদ্ধি আর ব্যবসাদারের স্বার্থান্ধতা মিলিত হওয়ায় তাদের খামখেয়ালী, অর্দ্ধসভ্য শাসনের ফলাফল অতি ভীষণ হ'ত।"

অবিরাম গৃহবিবাদ, আক্রমণ, পরাজয়, বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির দরুণ ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদের কাছে জটিল ও সংহারকরূপে দেখা দেয়। কিন্তু এ সমস্ত ঘটনা সমাজের বহিরাবরণ স্পর্শ করে গেছে মাত্র, আমূল পরিবর্ত্তন আনে নি। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে ভারতীয় সমাজের আসল কাঠামো একেবারে ভেঙ্গে গেছে; এখনও তা নতুন করে গড়ে ওঠার কোন চিহ্ন নেই। ভারতবর্ষ তার প্রাচীন জীবন হারিয়ে ফেলেছে, নতুন জীবন পায় নি। ইংরেজ শাসনে হিন্দুস্থান ঐতিহ্যচ্যুত হয়েছে, তার অতীতের সঙ্গে সংস্রব হারিয়েছে। এখনকার ভারতীয় জীবনে তাই শুধু বিষাদ নেই, একটা বিশেষ রকমের অবসাদও মিশে রয়েছে।

এশিয়াতে অতি প্রাচীনকাল হতে মোটামুটি তিনটী সরকারী বিভাগ চলে এসেছে। প্রথম হচ্ছে রাজস্ব বা স্বদেশের লুণ্ঠন; দ্বিতীয় হচ্ছে যুদ্ধ বা বিদেশের লুণ্ঠন; আর তৃতীয় হচ্ছে পূর্ত্তকার্য্য।

খাল কেটে চাষের জমিতে জলসেচন আর জল সরবরাহের ব্যবস্থা প্রাচ্যদেশে কৃষিকর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ। এর কারণ হচ্ছে আবহাওয়া আর ভৌগোলিক অবস্থা—বিশেষত, যে বিরাট মরুভূমি সাহারা থেকে আরব, পারস্য, ভারতবর্ষ আর তাতার হয়ে এশিয়ার সর্ব্বোচ্চ অধিত্যকাগুলি পর্য্যন্ত গেছে। সকলের পক্ষে সমান দরকারী জলের খরচ সম্বন্ধে বিশেষ হিসাবি না হলে চল্‌ত না। সেইজন্য পাশ্চাত্যে ফ্লাণ্ডার্স আর ইতালীতে অনেকে একত্র হয়ে যৌথ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল। প্রাচ্যদেশগুলি এ বিষয়ে ছিল পশ্চাৎপদ, আর তাদের আয়তন অতি বিশাল; তাই স্বেচ্ছাপ্রবুদ্ধ সমবায় প্রায় অসম্ভব বলে, সরকারকে ও ব্যাপারের ভার নিতে হয়েছিল। এশিয়ার সকল শাসনব্যবস্থায় ঐ কারণে পূর্ত্তবিভাগ

একটা বড় জায়গা আবহমান কাল থেকে নিয়ে এসেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মঠতার উপর ভূমির উর্ব্বরতা নির্ভর করত ; জলসেচন ও জলনির্গম ব্যবস্থায় অবহেলার ফল হত কৃষিকর্ম্মের বিনাশ। একথা মনে না রাখলে আমরা কিছুতেই বুঝ তে পারব না যে কেন পালমাইরা, পীট্রা, য়েমেন্, মিশর, পারস্য ও ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে এককালে খুব ভাল রকম চাষবাস হলেও পরে তা উষর মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল। একটীমাত্র সর্ব্বনাশী যুদ্ধের ফলে কেন একটা সভ্যতার সম্পূর্ণ বিলোপ হত, একটা দেশ বহুকাল জনশূন্য হয়ে থাকৃত, তার কারণও বুঝতে পারব।

ইংরেজ ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী পূর্ব্বগামীদের কাছ থেকে রাজস্ব আর যুদ্ধবিভাগ নিয়েছে বটে, কিন্তু পূর্ত্তকার্য্যকে সম্পূর্ণই অবহেলা করে এসেছে। ইংরেজদের অবাধ প্রতিযোগিতা-নীতি ভারতবর্ষের কৃষিক্ষেত্রে অচল বলে চাষের দারুণ অবনতি ঘটেছে। কিন্তু এক শাসনে কৃষিকর্ম্ম বিগ্ড়ে গিয়ে অন্য শাসনে তার পুনরুদ্দীপনের দৃষ্টান্ত এশিয়াতে দুর্লভ নয়। তাই শস্যোৎপাদনের প্রতি শাসকদের অবহেলার ফল অত্যন্ত শোচনীয় হলেও তার দরুণ ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা পর্য্যদস্ত হওয়ার কোন আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু ইংরেজ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটী ব্যাপার ভারতবর্ষে প্রবেশ করল, যা সমগ্র এশিয়ার ইতিহাসে একেবারে অভূতপূর্ব্ব। নানা রাজ-নৈতিক বিগ্রহ সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাস সমাজ-জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন আনে নি। সে সমাজের খুঁটি ছিল চরকা আর তাঁত। স্মরণাতীত কাল থেকে ইয়োরোপ ভারতীয় তাঁতিদের বোনা কাপড় কিনে এসেছে, আর তার বদলে পাঠানো সোঁনারূপা দিয়ে দেশের সেকরারা

ভূষণপ্রিয় জনসাধারণের তুষ্টিসাধন করেছে। সেকরাকে বাদ দিলে গ্রামের জীবন চল্‌ত না। দেশের সর্ব্বনিম্নশ্রেণীতেও গহনার চলন বেশী ছিল, অন্নবস্ত্রের অভাব সত্ত্বেও গলায় হার, আঙ্গুলে আংটি, হাতে চুড়ি, পায়ে মল ব্যবহার হত খুব। একটু সম্পন্ন পরিবারে সোনা বা রূপায় তৈরী দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখা যেত। সেই দেশে ইংরেজ ঢুকে তাঁত ভাঙ্‌ল, চরকাকে নষ্ট কর্‌ল। প্রথমে তারা ভারতবর্ষের কার্পাসকে ইয়োরোপের বাজার থেকে তাড়াল, তারপর পাকানো সূতা পাঠাতে লাগ্‌ল, আর শেষে কার্পাসের মাতৃভূমিকেই বিদেশী কাপড়ে ভাসিয়ে দিল। ১৮১৮ থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে বিলাত থেকে সূতা রপ্তানী ৫,২০০ গুণ বেড়েছিল। ১৮২৪ সালে ভারতবর্ষে দশলক্ষ গজ বিলাতী কাপড় আমদানী হত কিনা সন্দেহ; অথচ ১৮৩৭ সালে ৬ কোটী ৪০ লক্ষ গজেরও বেশী আমদানী হয়েছিল। ঐ সময়েই ঢাকার লোকসংখ্যা দেড় লক্ষ থেকে বিশ হাজারে নাম্‌ল। শুধু যে বস্ত্রশিল্পের পীঠস্থানগুলিরই পতন হল তা নয়; ফল হল আরও ভয়াবহ। সারা হিন্দুস্থানে কৃষি ও শিল্পকর্ম্মের মধ্যে যে যোগসূত্র ছিল, তা ইংরেজদের বিজ্ঞান আর বাষ্পযন্ত্র একেবারে ছিন্ন করে দিল।

অন্যান্য প্রাচ্যদেশীয়ের মত ভারতবাসীরা কৃষিবাণিজ্যের প্রধান সহায় পূর্ত্তকার্য্যের ভার সরকারের হাতে ছেড়ে নিশ্চিন্ত হত, অত বড় দেশে ছড়িয়ে গিয়ে ছোট ছোট গ্রামে জড় হত আর কৃষিশিল্পাদি গৃহকর্ম্মের মত চালাত। অতি প্রাচীন কাল থেকে তাদের বসবাসের এই বন্দোবস্ত চলে এসেছে, আর একেই আমরা "পল্লী-ব্যবস্থা" (village system) বলে জানি। প্রত্যেক ছোট গ্রামেরই

স্বতন্ত্র জীবনধারা ও শাসন-শৃঙ্খলা ছিল। বিলাতের পার্লামেন্টে পেশ করা একটা পুরাণো সরকারী রিপোর্ট থেকে এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমরা ধারণা করতে পারব:—

"ভূগোলের দিক থেকে দেখলে একটা গ্রামে আছে কয়েক শো বা কয়েক হাজার একর চাষের জমি আর পোড়ো জমি। রাষ্ট্রনীতির দিক থেকে দেখলে সেই গ্রামের সঙ্গে একটা সমবায় বা পৌরসঙ্ঘের সাদৃশ্য বোঝা যাবে। প্রধান বাসিন্দা বা পটেল গ্রামের সমস্ত ব্যাপারেরই তত্ত্বাবধান করেন, গ্রামবাসীদের বিবাদ নিষ্পত্তি করেন, শান্তিরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখেন আর খাজনা আদায় করেন; গ্রামের মুহুরি চাষবাসের হিসাব-দপ্তর রাখেন; একজন বা দুজন ফৌজদারী ব্যাপারের ভার নিয়ে থাকেন আর পথিকদের একগ্রাম থেকে অন্য গ্রামে নিরাপদে পৌঁছে দেন; একজন গ্রামের চৌহদ্দি স্থির রাখেন, দরকার হলে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেন; পুকুর, নালা ইত্যাদির তত্ত্বাবধায়ক চাষের জন্য জল বিলির ব্যবস্থা করেন; ব্রাহ্মণের উপর দেবপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ভার থাকে; গুরুমশায় ছেলেমেয়েদের হাতে খড়ি দেন; জ্যোতিষী পাঁজি দেখে শুভ অশুভ দিন স্থির করেন। সাধারণত এই কয়েকজন কর্ম্মচারী গ্রামের কাজ চালিয়ে যান; তাদের সংখ্যা কোথাও বা বেশী, কোথাও বা কম। স্মরণাতীত কাল থেকে এইরকম সাদাসিদে ভাবে গ্রামের শাসন চলে এসেছে। গ্রামগুলির চৌহদ্দি নিয়ে অদলবদল অতি কদাচিৎ হয়েছে। আর যুদ্ধ বা দুর্ভিক্ষ বা মহামারীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হলেও গ্রামের জীবন বিশেষ বদলায় নি। একই নাম, পরিমিতি, চিন্তাধারা, গোষ্ঠীবর্গ পর্য্যন্ত বহুকাল ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে রয়েছে। রাষ্ট্রের উত্থানপতন নিয়ে গ্রামবাসীরা ব্যতিব্যস্ত হয় নি; গ্রামের অস্তিত্ব

যতদিন অক্ষুণ্ণ, ততদিন রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্ত্তন তাদের বিচলিত করতে পারে নি, গ্রামের অন্তর্ব্যবস্থায় কোন বিকৃতি ঘটে নি। এখনও গ্রামের মোড়ল পটেল; ঝগড়া নিষ্পত্তি, সাজার ব্যবস্থা আর খাজনা আদায়ের ভার তার হাতে।"

সমাজব্যবস্থার এই ছোট অথচ অটল ছাঁচগুলি এখন ভেঙে গেছে বা যাচ্ছে। ইংরেজ সৈনিক আর টেক্স সংগ্রাহকের অত্যাচারের চেয়ে ভারতীয় জীবনে ইংরেজদের বাষ্পযন্ত্র আর অবাধ বাণিজ্যনীতির (ফ্রী ট্রেড্) প্রাদুর্ভাবই এর কারণ। পল্লীসমাজে প্রত্যেক পরিবার ছিল আত্মনির্ভর; ঘরেই চরকা কাটা, কাপড় বোনা হত, বাড়ীর লোকই স্বহস্তে চাষবাস করত। ইংরেজ আসার ফলে চরকা আর তাঁত বন্ধ হল, ছোটি ছোট অর্দ্ধসভ্য সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ভেঙে গেল, আর এমন এক বিরাট সমাজবিপ্লব আরম্ভ হল, যার তুলনা এশিয়ার ইতিহাসে মেলে না।

অসংখ্য নিরীহ, শ্রমশীল, কুলপতিশাসিত পল্লীসমাজ ছিন্নভিন্ন হল, প্রাচীন জীবনধারা ও জীবিকানির্ব্বাহের বংশপরম্পরাগত ব্যবস্থা নষ্ট হল, যন্ত্রণার অবধি রহিল না। এ ঘটনায় আমরা দুঃখ পাই নিশ্চয়, কিন্তু আমরা ভুলতে পারি না যে এই নিরীহ পল্লীসমাজগুলিই ছিল প্রাচ্য স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের যথার্থ ভিত্তি, এরা মানুষের মনকে ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে অবরুদ্ধ করে রাখ্ত, এদের শাসনে মানুষ হত নিষ্ক্রিয়, কুসংস্কার ও প্রাচীন বিধিনিষেধের দাস, নিজের মহিমা ও পৌরুষ সম্বন্ধে উদাসীন। আমরা ভুলতে পারি না যে তাদের ছিল একপ্রকার বর্ব্বরসুলভ অহমিকা; তাদের অনুরাগ ছিল শুধু খানিকটা জমির উপর; সাম্রাজ্যের পতন, অকথ্য অত্যাচার, জনহত্যা তাদের কাছে প্রাকৃতিক ঘটনার মত লাগ্ত, বিচলিত

করত না ; অথচ তাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিয়ে কেউ আক্রমণ করলে তারা ছিল একেবারে অসহায়। আমরা ভুলতে পারি না যে এই নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট, অশ্রদ্ধেয় অস্তিত্বের প্রতিক্রিয়ারূপে উৎকট, লক্ষ্যহীন অনাচারের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল, নরহত্যা পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবেশ করেছিল। আমরা ভুলতে পারি না যে এই ক্ষুদ্র সমাজগুলিকে জাতিভেদ ও দাসপ্রথা কলুষিত করে রেখেছিল, সেখানে মানুষ তার পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধককে পরাভূত করার চেষ্টা না করে বশ্যতা স্বীকার করত। অচঞ্চল, অন্ধ নিয়তিতে বিশ্বাস সামাজিক উদ্যোগ ও উন্নতি-প্রচেষ্টাকে নিষ্পিষ্ট করত, প্রকৃতিপূজার বিধানে মানুষের অধঃপতন সূচিত হত, আর জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ নতজানু হয়ে হনুমান ও গোমাতার অর্চ্চনা করত।

এ কথা সত্য যে ইংরেজ যে উদ্দেশ্য নিয়ে হিন্দুস্থানে এই সমাজ-বিপ্লব ঘটিয়েছিল তা নিন্দনীয়, আর তারা প্রাচীন ব্যবস্থার একেবারে উচ্ছেদ করেছিল। কিন্তু সে আলোচনা এখন অপ্রাসঙ্গিক। প্রশ্ন হচ্ছে এই :—এশিয়ার সমাজব্যবস্থায় আমূল বিপ্লব না এলে সমগ্র মানবজাতির পক্ষে অভীষ্টসাধন সম্ভব কি না ? যদি না হয়, তবে শত অপরাধ সত্ত্বেও সেই বিপ্লবে ইংলণ্ড অজ্ঞাতসারেই ইতিহাসের হাতিয়ার হয়ে কাজ করেছে।

তাই এক প্রাচীন সমাজধারার বিনাশদৃশ্য আমাদের যতই মনঃপীড়ার কারণ হোক্ না কেন, শুধু ইতিহাসের একটা ঘটনা হিসাবে তাকে দেখলে আমরা গ্যয়েটের কথায় বলতে পারি :—"এই যে কষ্ট আমাদের কষ্টের আকাঙ্খাকেই বাড়িয়ে চলে, তাতে কি আমাদের ক্লিষ্ট হওয়া উচিত ? তৈমুরের শাসন কি অসংখ্য মানুষকে গ্রাস করে নি ?"

দুই

ভারতে ইংরেজ আধিপত্য কেমন করে স্থাপিত হল? মোগল সম্রাটের সার্ব্বভৌমত্ব মোগল সুবাদাররা ভেঙেছিল। সুবাদারদের ক্ষমতা মারহাট্টারা নষ্ট করল। আফগানরা মারহাট্টা শক্তিকে পরাভূত করল, আর যখন সকলে সকলের সঙ্গে সংগ্রামে ব্যস্ত, তখন ইংরেজ জোর করে ঢুকে সকলকে পরাস্ত করল। ভারতবর্ষে ছিল হিন্দু-মুসলমানের ভেদ, জাতিভেদ, বর্ণভেদ; সমাজের মধ্যে পরস্পর বিপ্রকর্ষণ ও স্বভাবজ অনাত্মীয়ভাব ব্যাপক হওয়াতে একপ্রকার ভারসাম্যের সৃষ্টি হয়েছিল, আর তাই ছিল সমাজের ভিত্তি। এরূপ দেশ ও সমাজের পরাভব কি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টই ছিল না? হিন্দুস্থানের অতীত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হলেও আমরা কি এই স্থূল অথচ অবিবাদ্য কথাটী জানতাম না যে ইংরেজ ভারতের অর্থে পুষ্ট ভারতীয় সিপাহীর সাহায্যেই ভারতবর্ষকে পদানত রেখেছে? বিদেশীর কবলে যাওয়া ভারতবর্ষের পক্ষে ছিল অবশ্যম্ভাবী; ভারতবর্ষের ইতিহাস হচ্ছে বারবার পরাজয়ের ইতিহাস। ভারতীয় সমাজের কোন ইতিহাস নেই—অন্তত সে ইতিহাস আমাদের অজানা। আমরা যাকে ভারতের ইতিহাস বলি, তা হচ্ছে সদাসহিষ্ণু, সহজবাধ্য, পরিবর্ত্তন-বিমুখ সমাজের উপর বহু আক্রমণকারী যে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তার বর্ণনা মাত্র।

ভারতে ইংরেজের কাজ ছিল দু'রকমের—এশিয়ার সনাতন সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করা, আর সেখানে পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ভিত্তিস্থাপন করা।

আরব, তুর্কী, তাতার, মোগল প্রভৃতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করার পর শীঘ্রই হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল; ইতিহাসের ধারা অনুযায়ী বর্ব্বর বিজেতারা সভ্য বিজিতের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিল। ভারতবিজেতাদের মধ্যে ইংরেজই প্রথম সভ্যতায় অধিক অগ্রসর বলে হিন্দুসংস্কৃতির কাছে বশ্যতা মানে নি। বরং ইংরেজ এসে দেশের সমাজকে ভেঙেছে, শিল্পকে নির্ম্মূল করেছে, সমাজের যা কিছু মহৎ ও শ্রেষ্ঠ ছিল তার বৈশিষ্ট্য নষ্ট করেছে। তাদের ভারতশাসনের ইতিহাসে এখনও শুধু ধ্বংসেরই বর্ণনা আছে, ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে পুনর্গঠনচেষ্টা প্রকাশ হতে পারে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুনর্গঠন আরম্ভ হয়ে গেছে বলা যায়।

ভারতে পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রথম প্রয়োজন ছিল মোগল-সাম্রাজ্যের চেয়ে সুদূরবিস্তারী ও সুসংহত রাষ্ট্রিক ঐক্য। ইংরেজের অস্ত্র ভারতবর্ষের উপর সে ঐক্য চাপিয়েছে, আর তা এখন বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের কল্যাণে দৃঢ় ও স্থায়ী হবে। স্বরাজ অর্জ্জনে আর বিদেশী আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষায় যাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন, সেই ভারতীয় সৈন্যদলকে ইংরেজ গড়ছে, অস্ত্রশিক্ষা দিচ্ছে। যে স্বাধীন সংবাদপত্র এশিয়াতে এই প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়েছে আর যা এখনও প্রধানত ফিরিঙ্গীদের করায়ত্ত, তা হচ্ছে জাতির পুনর্গঠনে এক অভিনব শক্তি। এশিয়ার সমাজে ভূস্বত্ব সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা ছিল না; কিন্তু জমিদারী ও রায়তওয়ারী ব্যবস্থা জঘন্য হলেও ভূস্বামিত্বের দুই প্রকারভেদ তার অন্তর্ভুক্ত। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ অল্প কয়েকজন ভারতীয়কে কলকাতায় শিক্ষা দিচ্ছে বলে ইয়োরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানে পারদর্শী আর দেশশাসনব্যবস্থায় সুদক্ষ এক নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে। বাষ্পযানের কল্যাণে ভারতবর্ষ

ও ইয়োরোপের যোগাযোগ দ্রুত ও নিয়মিত হয়েছে, দক্ষিণপূর্ব্বে বিরাট মহাসাগরের বন্দরগুলির সঙ্গে দেশের সকল প্রধান বন্দরের নিকটসম্বন্ধ ঘটেছে, ভারতবর্ষের পঙ্গুতার যে প্রধান কারণ ছিল বিদেশের সংস্রববর্জ্জন, তা থেকে দেশ উদ্ধার পেয়েছে। এখন আর সেদিন সুদূরপরাহত নয়, যখন রেল আর জাহাজে মিলে ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ডের দূরত্ব সময়ের মাপে আট দিন মাত্র করে দেবে, আর যে দেশের অতীত গৌরবকাহিনী বিশ্ববিশ্রুত ছিল, সে দেশ পাশ্চাত্য জগতেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

ভারতবর্ষের প্রগতি সম্বন্ধে বিলাতের শাসকসম্প্রদায় এ যাবৎ বিশেষ মাথা ঘামায় নি। সেখানকার অভিজাতশ্রেণী চেয়েছিল দেশটাকে ঘটা করে জয় করতে, পুঁজিদাররা চেয়েছিল লুঠ করতে, আর কারখানার মালিকরা চেয়েছিল সস্তায় নিজেদের মাল বেচার সুবিধা যোগাড় করতে। কিন্তু এখন অবস্থা বদ্‌লেছে। মালিকরা বুঝছে যে তাদের নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখতে হলে ভারতবর্ষেই কিছু শিল্পোৎপাদন দরকার, আর সেইজন্য দেশের মধ্যে জলসেচব্যবস্থা ও যাতায়াতের রাস্তা নির্ম্মাণ একেবারেই অপরিহার্য্য। তাই দেখি যে তারা মোটা মুনফা রেখে সমস্ত দেশে রেললাইন পাততে চায়, পাত্‌বেও। এর ফল হবে একেবারে কল্পনাতীত।

সকলেই জানে যে দেশের নানা উৎপন্ন দ্রব্য স্থানান্তরে পাঠানো ও বিক্রীর ব্যবস্থার অভাবে ভারতবর্ষের উৎপাদনী শক্তি পঙ্গু হয়ে রয়েছে। প্রচুর শস্যোৎপাদনসত্ত্বেও নিদারুণ দৈন্য ভারতবর্ষের চেয়ে কোন দেশের বেশী নেই, আর এর একটা প্রধান কারণ হচ্ছে বিনিময়ব্যবস্থার অভাব। ১৮৪৮ সালে ইংরেজদের হাউস অফ

কমন্সে প্রমাণ হয়েছিল যে যখন পুণায় ২ মণ ৭ সের শস্যের দাম ছিল ৬৪ থেকে ৭০ শিলিং, আর খাদ্যাভাবে রাস্তাঘাটে লোক মরছিল, তখন খান্দেশে ঐ ২ মন ৭ সেরের বাজারদর ছিল ৬ থেকে ৮ শিলিং; কিন্তু মেটে রাস্তায় চলাফেরাই প্রায় অসম্ভব ছিল বলে খান্দেশ থেকে সরবরাহ আসতে পারে নি।"

রেলের প্রবর্ত্তনে সহজে চাষের উন্নতি হতে পারে যদি যেখানে বাঁধের জন্য জমি দরকার সেখানে জলাশয়ের ব্যবস্থা হয় আর বরাবর রেললাইনের পাশাপাশি সরু নালা কেটে জলনির্গমের বন্দোবস্ত থাকে। এই উপায়ে প্রাচ্যদেশে কৃষিকর্ম্মের পক্ষে যা একান্ত প্রয়োজন সেই জলসেচনপ্রণালী বিস্তৃত হতে পারে আর জলাভাবের দরুণ প্রায়ই যে দুর্ভিক্ষ লেগে থাকে তার নিরাকরণ হয়। এ দিক থেকে রেলপথের উপকারিতা যে কত তা আমরা বুঝি যখন দেখি যে, যে সমস্ত জেলায় জলসেচন ব্যবস্থা নেই তাদের তুলনায় যেখানে সে ব্যবস্থা আছে সেখানে খাজনা আদায় হয় তিনগুণ, ব্যবসা দশবারো গুণ বাড়ে আর মুনফা থাকে বারো বা পনের গুণ।

এ ছাড়া রেলের দরুণ সমরবিভাগের খরচ কমবে। গড় উইলিয়মের কর্ণেল ওয়ারেন হাউস্ অফ কমন্সের সিলেক্ট কমিটিতে বলেছিলেন:—"দেশের যে সব দূর প্রান্ত থেকে খবর আসতে এখন কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ লাগে, সেখান থেকে কয়েক ঘণ্টাতে খবর এলে বা কেন্দ্র থেকে সে সব জায়গায় সৈন্য, মালপত্র ও কর্ত্তৃপক্ষের হুকুম পাঠানো সম্ভব হলে প্রভূত উপকার হবে। এখন দূরে কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় পল্টন রাখা চলে না, তখন তা চলবে; রোগের উৎপাত কমবে, বহুলোকের প্রাণ বাঁচবে। পল্টনের

ভাণ্ডারে অতিরিক্ত মাল রাখার দরকার থাকবে না, জিনিষপত্র পচবে না বা আবহাওয়ার দরুণ নষ্ট হবে না। সৈনিকরা আগের চেয়ে কর্ম্মঠ হলে তাদের সংখ্যা সেই অনুপাতে কমানো চলবে।”

আমরা জানি যে ভারতীয় পল্লীসমাজের শাসনব্যবস্থা নষ্ট হয়েছে, তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি উৎপাটিত হয়েছে; কিন্তু তাদের যে বৈশিষ্ট্য ছিল একেবারে অপকৃষ্ট তা এখনও জীবন্ত রয়েছে। সে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই, যে তারা সমাজকে পরিবর্ত্তনবিমুখ অসংশ্লিষ্ট অণু-পরমাণুতে ভাগ করে দেয়। এই গ্রাম্য স্বাতন্ত্র্য ভারতবর্ষে ভাল রাস্তার অভাবের কারণ; আবার রাস্তার অভাবে সেই স্বাতন্ত্র্য পরিপুষ্ট হয়ে এসেছে। এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের সংস্রব প্রায় ছিল না, সভ্য জীবনের উপকরণ, সামাজিক উন্নতির চেষ্টা বা ইচ্ছা পর্য্যন্ত ছিল না। ইংরেজ গ্রামের এই স্বাভিমানী জড়তাকে ভেঙে দিয়েছে; এখন রেল আসার ফলে দেশের লোকের পক্ষে স্থান থেকে স্থানান্তরে যাতায়াত আর অপরিচিতদের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন সহজ হবে। তা' ছাড়া “রেল চলার একটা ফল এই হবে যে গ্রামে গ্রামে বিদেশী শিল্পীদের কৌশল ও উপকরণাদি সম্বন্ধে খবর ছড়িয়ে পড়বে, সেরকম উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে, যারা পুরুষানুক্রমে গ্রামের শিল্পী ছিল তাদের নৈপুণ্যের পরীক্ষা হবে, ক্রটী সংশোধন হবে” (চ্যাপমান, “দি কটন্ এণ্ড কমার্স অফ ইণ্ডিয়া”)।

আমি জানি যে বিলাতের কারখানার মালিকেরা সস্তায় তুলা ও অন্যান্য কাঁচা মাল যোগাড় করার উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষে রেলপথ বিস্তার করতে চেয়েছে। কিন্তু যে দেশে লোহা আর কয়লার খনি আছে, সে দেশের যানব্যবস্থায় একবার যন্ত্রের প্রবর্ত্তন হলে সেখানে

আর যন্ত্রনির্ম্মাণকে প্রতিরোধ করা যায় না। একটা বিরাট দেশে রেলপথের শাখাপ্রশাখা বজায় রাখতে গেলে রোজকে রোজ যা দরকার তা সরবরাহের জন্য কারখানা চাই। এর ফলে যে সব শিল্পের সঙ্গে রেলের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই, তাদের চাহিদা মেটাবার জন্য কলকব্জার প্রচলন বাড়বে। তাই রেলপথের ব্যবস্থা সত্যই ভারতবর্ষে আধুনিক কলকারখানার অগ্রদূত হবে। যখন ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা স্বীকার করেছেন যে ভারতবাসীরা এই নতুন ধরণের কাজে নিজেদের বেশ থাপ খাইয়ে নিচ্ছে আর কলকব্জা সম্বন্ধে যা জানা দরকার তা বেশ বোঝে, তখন আর এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কলকাতার টাকশালে ও অন্যান্য যায়গায় ভারতীয়েরা বহু বৎসর ধরে যে নৈপুণ্য দেখিয়েছে, তা' থেকে এ কথার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাবে। ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একদেশদর্শিতা দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হলেও মিষ্টার ক্যাম্বেল স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে "ভারতীয় জনসাধারণের কর্ম্মক্ষমতা বিপুল, মূলধন সঞ্চয় করার যোগ্যতা যথেষ্ট, গণিতবিজ্ঞানে নৈপুণ্য অসামান্য।" যে পুরুষানুক্রমিক কর্ম্মভেদ ছিল জাতিভেদের ভিত্তি, রেলপথ বিস্তারের ফলে আধুনিক শিল্পের প্রবর্ত্তন হওয়ায় তা নষ্ট হবে, ভারতের প্রগতি ও গণশক্তির পথে যে চরম অন্তরায় ছিল তা অপসৃত হবে।

অবশ্য ইংরেজ বুর্জ্জোয়াশ্রেণী যা করতে বাধ্য হতে পারে, তাতে গণসাধারণের দাসত্বমোচন বা সামাজিক অবস্থার উন্নতিও হবে না। সে জন্য শুধু দেশের উৎপাদনীশক্তির সংবর্দ্ধন নয়, সে শক্তিকে গণসাধারণের করায়ত্ত করা প্রয়োজন। ইংরেজ শাসনে এই উভয়

ব্যবস্থার বাস্তব ভিত্তি নিশ্চয় স্থাপিত হবে। কিন্তু কোথাও কি বুর্জ্জোয়াশ্রেণী এর বেশী কিছু করেছে? তারা কি কখনও মানুষকে রক্ত আর পঙ্কিলতা আর দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্য দিয়ে না টেনে সমাজের উন্নতি সাধন করতে পেরেছে?

যতদিন বিলাতের শ্রমিকরা শাসকশ্রেণীকে নিষ্কাসিত না ক'রে, কিম্বা ভারতীয় জনসাধারণ আত্মশক্তিবলে ইংরেজের শাসনশৃঙ্খল চূর্ণ না করে, ততদিন ইংরেজ বুর্জ্জোয়ারা ভারতবর্ষের সমাজক্ষেত্রে যে নতুন বীজ বপন করেছে তার ফল ভারতবাসী পাবে না। তবু আমরা নিশ্চিন্ত মনে সেদিনের প্রতীক্ষা করতে পারি যখন শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক্, সেই বিশাল, চিত্তাকর্ষক দেশের পুনর্জীবন আসবে, যে দেশের শান্ত অধিবাসীরা প্রিন্স সল্টিকভের ভাষায় "ইতালিয়ানদের চেয়ে মার্জ্জিত ও নিপুণ," যারা বশ্যতাস্বীকার করলেও নিজেদের সৌম্য আভিজাত্য হারায় নি, যারা স্বাভাবিক শৈথিল্য সত্ত্বেও যুদ্ধে অসাধারণ বীর্য্য দেখিয়ে ইংরেজ নায়কদের আশ্চর্য্য করেছে, যাদের দেশ হচ্ছে আমাদের ভাষা, আমাদের ধর্ম্মের উৎস, যাদের জাটদের মধ্যে প্রাচীন জার্ম্মাণ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রাচীন গ্রীকের মূর্ত্তি আমরা দেখতে পাই।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই আলোচনার উপসংহারে আমি কয়েকটী কথা বলতে চাই।

বুর্জ্জোয়া সভ্যতার যে নিগূঢ় কাপট্য ও স্বভাবজ বর্ব্বরতা স্বদেশে ভদ্রবেশধারণের চেষ্টা করে, বিদেশে আধিপত্য বিস্তারের সময় তা আমাদের চোখের সাম্‌নে নগ্ন, অনাবৃতরূপে দেখা দেয়। বুর্জ্জোয়া-শ্রেণী হচ্ছে ব্যক্তিস্বত্বের সংরক্ষক; কিন্তু বাংলা, মাদ্রাজ আর

বোম্বাইয়ে ভূসম্পত্তি নিয়ে তারা যে বিপ্লব ঘটিয়েছে, সে রকম কি কোন বিপ্লবী দল পেরেছে ? ভারতবর্ষে তাদের দৌরাত্ম্য যখন শুধু ঘুষে সন্তুষ্ট হয় নি, তখন কি, ফন্দিবাজ ক্লাইভের ভাষাতেই, তারা নিদারুণ অত্যাচার আরম্ভ করে নি ? যখন ইয়োরোপে তারা সরকারী দেনার (National debt) অলঙ্ঘ্য পবিত্রতা সম্বন্ধে শতমুখ, তখন তারাই কি ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভাণ্ডারে ভারতীয় রাজাদের গচ্ছিত টাকা বাজেয়াপ্ত করে নি ? "আমাদের পূত ধর্ম্মের" সংরক্ষণের অজুহাতে যখন তারা ফরাসী বিপ্লবীদের সঙ্গে সংগ্রাম করছিল, তখন কি তারাই ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচার বন্ধ করে নি, উড়িষ্যা আর বাংলার নানা মন্দিরে যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের ব্যবসা ফাঁদে নি, জগন্নাথমন্দিরে ভ্রষ্টাচারের সুবিধা নিয়ে লাভের চেষ্টা দেখে নি ? এরাই হচ্ছে "স্বত্ব, সমাজশৃঙ্খলা, পারিবারিক শুচিতা ও ধর্ম্মের" অভিভাবক !

ভারতবর্ষ প্রায় ইয়োরোপের মত বিশাল। সেখানে বিলাতী শিল্পব্যবস্থার দারুণ ফল প্রত্যক্ষ করে আমরা বিক্ষুব্ধ হই। কিন্তু এ কথা ভুল্‌লে চলবে না যে ঐ ফলাফল হচ্ছে বর্ত্তমান উৎপাদন পদ্ধতির অচ্ছেদ্য পরিণাম। পুঁজিদারদের আধিপত্যের উপর সে পদ্ধতি নির্ভর করছে। মূলধনকে স্বতন্ত্র শক্তিরূপে রাখতে হলে তাকে কেন্দ্রস্থ করা প্রয়োজন। সভ্যজগতের প্রতি শহরে অর্থনৈতিক বিধি অনুসারে শিল্পবাণিজ্য চলেছে ; সেই বিধি সমস্ত পৃথিবীর দখল করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলে তার সংহারমূর্ত্তি আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু ইতিহাসের এই বুর্জ্জোয়াযুগে নতুন জীবনের বনিয়াদ পাতা হবে—একদিকে পরস্পরনির্ভরতা, ও যাতায়াতের সুবিধার দরুণ নানা জাতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন, আর একদিকে

বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রকৃতির প্রতিরোধ দূর করে উৎপাদনীশক্তি বর্দ্ধন। ভূগর্ভীয় বিপ্লব যেমন পৃথিবীর বহিরাকারকে সৃষ্টি করেছে, তেমনি বুর্জ্জোয়া শিল্পবাণিজ্য নতুন সমাজের বাস্তব ভিত্তিস্থাপন করবে। যখন এক বিরাট সমাজবিপ্লব বুর্জ্জোয়াযুগের ফলাফলকে, শিল্পবাণিজ্যের আধুনিক ব্যবস্থাকে পৃথিবীর প্রগতিশীল জনসাধারণের করায়ত্ত করবে, তখন যে হিন্দুদেবতা নিহতের খর্পর বিনা সুধাপানেও অস্বীকৃত হত, তার সঙ্গে মানবসভ্যতার সাদৃশ্য দূর হবে।

প্রগতি-সাহিত্যের রূপ

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

প্রগতি-সাহিত্যকে আমরা কোন্ সংজ্ঞা দান করব? সাধারণ সাহিত্য থেকে প্রগতি-সাহিত্যের পার্থক্য কোন্‌খানে? কোন্‌খানে তার বৈশিষ্ট্য? রম্যাঁ রলাঁ, ম্যাক্সিম গোর্কি, র‍্যাল্‌ফ ফক্স প্রমুখ মনীষীদের লেখা প'ড়ে প্রগতি-সাহিত্য সম্পর্কে আমার মনে যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, সে বিষয়ে কিছু বল্‌তে চাই।

প্রগতি-সাহিত্যের ভিত্তি বাস্তবের উপরে। প্রকৃতপক্ষে কোন সাহিত্যিকই বাস্তবকে উপেক্ষা করতে পারে না। তাকে রসসৃষ্টি করতে হয়—সমাজের আর দশজন মানুষের রুচির দিকে দৃষ্টি রেখে। চারিপাশের নরনারীর রুচিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে কল্পনা যখন বল্গা ছেঁড়া ঘোড়ার মত উদ্দামবেগে ধেয়ে চলে, তখন রসসৃষ্টি আর্টের কোঠায় পড়ে না, পাগলামির কোঠায় পড়ে। তবুও বাস্তবকে প্রাচীন-সাহিত্য ঠিক যে চোখে দেখেছে, প্রগতি-সাহিত্য সেই চোখ নিয়ে দেখে না, তার দৃষ্টিভঙ্গিমা স্বতন্ত্র। কথাটা আরও একটু পরিষ্কার ক'রে বলা প্রয়োজন। প্রগতি-সাহিত্যের পূজারী যে, তাঁরও আনন্দ নেই বাস্তবের নিষ্ফলতার মধ্যে। এমন একটা জগতের মধ্যে জন্মেছি আমরা, যেখানে দুঃখের অন্ত নেই, মানুষকে ছোট ক'রে বড় হ'য়ে উঠেছে টাকা। লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী মানুষ পরিণত হ'য়েছে ধনীদের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্রে। জীবনে তাদের কোনো

আনন্দ নেই, আশা নেই, উৎসাহ নেই। বেকারের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। ফ্যাশিজমের লৌহশকট দুর্ব্বল জাতিগুলির মেরুদণ্ড দিচ্ছে ভেঙে। ঘনিয়ে আসছে মহাসমরের মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি। ন্যায়ের দাবীকে পদতলে নিষ্পেষিত করে শক্তির তাণ্ডব নৃত্য চলেছে দিকে দিকে। এখানে আশা কোথায়? আলো কোথায়? মুক্তির আকাশ কোথায়?

বাস্তবের এই নিষ্ঠুর জতুগৃহকে এড়িয়ে গিয়ে কল্প-জগতে শান্তি খুঁজেছে প্রাচীন সাহিত্য। বেদনাকে সে ভুলতে চেয়েছে স্বপ্নে। অশ্রুজলে লবণাক্ত দুঃখসমুদ্রের মাঝে সে গ'ড়ে তুলেছে আর্টের শ্যামল দ্বীপটীকে এবং সেই শান্তরসাস্পদ দ্বীপের নির্জ্জন শ্যামলিমার মধ্যে খুঁজেছে প্রাণের আরাম। প্রগতি-সাহিত্য দুঃখ থেকে মুক্তি চায়—কিন্তু সে মুক্তি বাস্তবের দায়িত্বকে এড়িয়ে গিয়ে নয়। শান্তির চেয়ে জীবনের প্রতি তার অনুরাগ বেশী। বাস্তবকে ভেঙে তাকে নূতন রূপ দিতে চায় সে।

প্রগতি-সাহিত্যের স্রষ্টা বলে, চাই না সেই সুন্দরকে যার সঙ্গে বাস্তবের নেই যোগ। সে বলে, আনন্দের জগত আমিও করি কামনা—কিন্তু সে আনন্দে কেবল আমার একার নয়, সকলের থাকবে অধিকার। এই আনন্দের নবজগত সবাইকে নিয়ে। সাহিত্য এতদিন বাস্তবের মধ্যে এই নূতন জগৎ-সৃষ্টির দায়িত্বকে এসেছে এড়িয়ে। অজস্রধারায় কর্ম্মের প্রবাহ চলেছে দিকে দিকে। বাস্তব-জগতের এই কর্ম্মধারার সঙ্গে আর্ট আপনার আত্মীয়তাকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়েছে। অস্কার ওয়াইল্ডের কণ্ঠে কর্ম্মীকে কটাক্ষ ক'রে রসশিল্পী বলেছে—When man acts he is a puppet. When he describes he is a poet. আমাদের

দেশে আজও অনেকের ধারণা, কর্ম্ম নিম্নস্তরের লোকদের জন্য। যারা উচ্চস্তরের লোক, তাদের জন্য কর্ম্মের হাট নয়, জ্ঞানের অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ। জ্ঞানীর সেই গিরিশৃঙ্গের নির্জ্জনতাকে ভঙ্গ করে না জনসাধারণের কোলাহল।

কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের এই যে সর্ব্বনেশে বিচ্ছেদ—এই বিচ্ছেদই আর্টকে আজ এমন প্রাণহীন, নির্ব্বীর্য্য করেছে। বাস্তব জগতের লক্ষ লক্ষ মানুষের চঞ্চল জীবনধারার সঙ্গে নাড়ীর যোগকে হারিয়ে ফেলে সাহিত্য হ'য়ে গেছে মেরুদণ্ডহীন সৌন্দর্য্যবিলাসীদের খেলার সামগ্রী। প্রগতি সাহিত্য সকলের আগে চায় জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মের বিচ্ছেদকে ঘুচিয়ে দিতে। রলাঁর কণ্ঠে সে বলে, 'Thought' has no higher role than that of making itself the great soldier of the action that renews the world. যে কর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে বুর্জ্জোয়া সমাজ শ্রেণীহীন সমাজের (classless society) মধ্যে রূপান্তরিত হ'তে চলেছে—জ্ঞানকে হ'তে হবে সেই কর্ম্মের মহাসৈনিক। কর্ম্মের সাহায্য করাই হ'চ্ছে আজকের দিনে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ কাজ। প্রগতি সাহিত্যের ব্রত হবে নূতন জগত সৃষ্টির কাজে কর্ম্মের সহায় হওয়া।

এই নূতন জগত বাস্তবের উর্দ্ধে কল্পনার কোনো অশরীরী রূপকথার জগত নয়। এর ভিত্তি হবে আমাদের এই মাটীর পৃথিবীর উপরে। এই অভিনব জগতে মানুষকে শোষণ করবে না মানুষ। নরনারী পরাধীনতার অভিশাপ থেকে পাবে মুক্তি। জ্ঞানের উপরে, স্বাস্থ্যের উপরে, আনন্দের উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমস্ত মানুষের অধিকার। অলসের জীবন যাপন করবে না কেউ, লোভের প্রবৃত্তি পাবে না প্রশ্রয়। সবাই করবে কাজ, সবাই করবে

সমাজের সেবা। এই যে আদর্শ মানব-সমাজ—এই মানব-সমাজকে গড়বার জন্য কত বীর দিলো বুকের রক্ত; এরই স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে কত কবি গাঁথলো অমর কবিতার চির-অম্লান পুষ্পমাল্য। কার্ল মার্ক স্ এই অভিনব সমাজেরই সংজ্ঞা দিয়াছেন classless society আর এই শ্রেণীহীন সমাজকে গড়ে তুলবার জন্যই সারা পৃথিবীতে আরম্ভ হয়েছে নবযৌবনের অভিযান।

ধূলির উপরে স্বর্গ রচনার জন্য এই যে দিগন্তব্যাপী অভিযান—এই অভিযানে যোগ দিতে হবে সবাইকে। সকলের স্পর্শে পবিত্র-করা তীর্থনীরে ভরতে হবে মঙ্গলঘট। এই অভিযান থেকে সাহিত্যিকের দূরে থাকবার কোন অধিকার নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পড়েছিলাম—

বিশ্ব যদি চ'লে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
একা আমি ব'সে রব মুক্তি-সমাধিতে?

সেই মুক্তিসাধনার প্রয়োজন কি যার সঙ্গে বিরাট বিশ্বের সুখ-দুঃখের নেই কোন যোগ? নিজের মুক্তি নিয়ে করবো কি, যদি কোটী কোটী মানুষের জীবনে মুক্তির অমৃত অনাস্বাদিত থেকে যায়! ঠিক এই সুরের সঙ্গেই সুর মিলিয়ে আমরা বলতে পারি, কি হবে আর্টের কল্পলোকে বিচরণ ক'রে, যদি কোটী কোটী মানুষের জীবনের উপরে দুঃসহ দুঃখ জগদ্দল পাথরের মতই চেপে থাকে? সে আর্টের মূল্য কি যা পুরাতন বুর্জোয়া-সমাজকে চূর্ণ ক'রতে করে না সাহায্য? সে সাহিত্যের দাম কি, যা শ্রেণীহীন সমাজের সৃষ্টির পথে হয় না সহায়? একরকমের স্বার্থপরতা আছে যা বৈরাগ্যের মুখোস প'রে চলে। জগতকে অস্বীকার ক'রে এই স্বার্থপরতা আত্মার মুক্তিকেই জীবনের ধ্রুবতারা ব'লে মানে। বৈরাগ্যের

মুখোস-পরা এই স্বার্থপরতার মধ্যে আজ আমরা কোনই আধ্যাত্মিক মহিমার সন্ধান পাই না। ঠিক একই রকমের স্বার্থপরতা সৌন্দর্য্য-পূজার মুখোস প'রে আর্টের দোহাই দিয়ে এতদিন প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে। Art for Art's Sakeএর জয়গান গেয়ে সাহিত্যিকেরা অনেকদিন ধ'রে বৃহৎ জগতের দাবীকে অস্বীকার ক'রে এসেছেন। বাস্তবের আহ্বান উপেক্ষিত হ'য়েছে; কর্ম্মের নিমন্ত্রণে আর্ট দেয় নি কোন সাড়া; মঙ্গল সুন্দরের মন্দিরদ্বারে করাঘাত ক'রে ক'রে ব্যর্থমনোরথ হ'য়ে ফিরে গেছে—যেমন ক'রে দুর্ব্বাসা শকুন্তলার কাছ থেকে গিয়েছিলেন ফিরে। বাস্তবের প্রতি সাহিত্যের এই নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য আমাদের অন্তরে কোন বিরক্তির সঞ্চার করে নি—কারণ Art for Art's Sakeএর বুলি আমাদের চিত্তকে রেখেছিলো মোহাবিষ্ট ক'রে, জ্ঞান এবং কর্ম্মের মধ্যে আমরা খাড়া ক'রে রেখেছিলাম একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। আজ আমাদেব চোখের উপর থেকে অনেককালের পর্দ্দা গিয়েছে স'রে। আর্টকে, ধর্ম্মকে, নীতিকে, বিজ্ঞানকে বিচার করবার নূতন কষ্টিপাথর এসেছে আমাদের হাতে। এই কষ্টিপাথরটি হোলো শ্রেণীহীন সমাজের কষ্টিপাথর। সেই সাহিত্যেই আজ আমাদের প্রয়োজন, যা সেই সমাজ রচনা করবার অনুকূল। সেই বিজ্ঞানই আমাদের কাছে পূজা পাবে যার সঙ্গে নেই মানুষের মঙ্গলের বিচ্ছেদ। যন্ত্রকে তবেই আমরা আসন দেবো যদি সে মানুষের কল্যাণকে আঘাত না করে।

আমরা জানি এই নূতন সমাজ গ'ড়ে তুলবার সাধনাই প্রগতি সাহিত্যের সাধনা আর এই সাধনার পথ কণ্টকে পরিপূর্ণ। যা-নেই —তাকে সৃষ্টি করতে গেলে যা-আছে তাকে ভাঙতে হবে। পুরাতনের মৃত্যুকে আশ্রয় ক'রে আসে নবজীবনের সমারোহ। আমরা

যদি সেই অনাগত জগতকে সৃষ্টি করতে চাই যার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে জয়ের মহিমায় মহিমান্বিত নূতন মানব, আমাদের ভাঙতে হবে এই বুর্জ্জোয়া সমাজকে, কারণ এর কাছে বড়, মানুষ নয়—টাকা। এই ভাঙার কাজে হাত দিতে গেলেই বুর্জ্জোয়া সমাজের কাছ থেকে আসবে আঘাতের পর আঘাত, ক্ষতির পর ক্ষতি। এই আঘাত আর ক্ষতির জন্য প্রগতি সাহিত্যের স্রষ্টাকে তৈরী থাকতে হবে।

নূতন আদর্শের জয়গান করবার জন্য প্রগতি-সাহিত্যের যখন আবির্ভাব—তখন সংগ্রাম-গান ধ্বনিত হোক তার সতেজ কণ্ঠে। বুর্জ্জোয়া সমাজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষকে যন্ত্রের মত ব্যবহার ক'রে ক'রে তাকে বস্তুর পর্য্যায়ে নিয়ে এসেছে। সর্ব্বহারা মানুষ দুমুঠো ভাতের জন্য আত্মার গৌরবকে দিয়েছে বিসর্জ্জন, প্রাণকে দেহের সঙ্গে কোন রকমে যুক্ত রাখবার জন্য মনুষ্যত্বের গরিমাকে ফেলেছে হারিয়ে। ন্যায়কে ন্যায় জেনেও তার নিশান বহন করবার ক্ষমতা নেই তার। অন্যায়কে অন্যায় জেনেও তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস থেকে সে আজ বঞ্চিত। লক্ষ লক্ষ মানুষের এই ভীরুতা অর্থাৎ নৈতিক মৃত্যুকে আশ্রয় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে এই বুর্জ্জোয়া সমাজ। কোটী কোটী মানুষের সাহসের এই দৈন্যই শ্রেণীহীন সমাজ গড়বার পথে প্রবলতম অন্তরায়।

মানুষকে আজ শেখাতে হবে সর্ব্বাগ্রে মানুষ হ'তে। 'আবার তোরা মানুষ হ'—এই হবে নূতন যুগের গান। প্রতিধ্বনি নয়, ছায়া নয়, অপরের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র নয়—হ'তে হবে দৃপ্ত মানব, যার ব্যক্তিত্ব আছে, যার অধিকার আছে, যার ন্যায়কে অনুসরণ এবং অন্যায়কে আঘাত করবার সাহস এবং শক্তি আছে। প্রগতি-সাহিত্য দেখাবে মানুষকে নূতন রূপে। তার হাতে বিদ্রোহের জয়ধ্বজা; দৃঢ়

পাদবিক্ষেপে সে আগিয়ে চলেছে সভ্যতাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য; জগতকে রূপান্তরিত করবার সাধনায় সে ব্রতী। মানুষ নিজের দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে লড়াই করছে—সাহিত্যে তার সেই রূপ আমরা অনেকবার দেখেছি। প্রগতি-সাহিত্য দেখাবে তার নূতন যোদ্ধার রূপ। সে লড়াই কর্‌ছে প্রবলের উদ্ধত অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সে যুদ্ধ করছে পুরাতন সমাজব্যবস্থাকে উন্মূলিত করবার জন্য, সে দুর্ব্বার সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে বুর্জ্জোয়া-সমাজের শ্মশান-ভস্মের উপরে শ্রেণীহীন সমাজ গড়্‌বার সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে। ধনুঃশর হাতে মানুষের এই যে জ্যোতির্ম্ময় দৃপ্ত মূর্ত্তি—এই মূর্ত্তি রচনায় ব্রতী হয়েছে প্রগতি-সাহিত্য। প্রগতি-সাহিত্যের যে স্রষ্টা, সে শৌর্য্যের পূজারী, পৌরুষের উপাসক, মুক্তির অগ্রদূত, সাম্য-মন্ত্রের উদ্গাতা, পুরাতন জগতের সংহারকর্ত্তা, নূতন জগতের স্রষ্টা।

সাহিত্যে বাস্তব ও কল্পনা

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

সাহিত্যের সঙ্গে কল্পনার যেমন একটী নিত্যসম্বন্ধ আছে, তেম্‌নি অবাস্তবের সঙ্গে তার নিত্যবিরোধও অপরিহার্য্য। কল্পনা ও বাস্তবের দ্বন্দ্বের মসীকলঙ্কিত ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে ঐ উভয়ের সামঞ্জস্য একান্ত অসম্ভব। বাস্তব জীবনের কঠিন মৃত্তিকার সঙ্গে কল্পলোকের ছায়াময় নীহারিকা-পুঞ্জের আলোকবর্ষ দূরত্বের ব্যবধান লোকদৃষ্টিতে অনতিক্রম্য; তাই এ দ্বন্দ্বের মধ্যে ঐক্যসূত্রের সন্ধানে বহু সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক বাক্যারণ্যে পথভ্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশুদ্ধ সূক্ষ্মদর্শনের উপর নিশ্চিন্ত নির্ভরশীল নয়; সুতরাং যুক্তিবাদী চিন্তাপদ্ধতির সাহায্যে মানুষ নিষ্ক্রিয় নব্যন্যায়ের বাক্যযোজনার কুশাগ্র বুদ্ধির নিষ্ফলতা ও কীর্ত্তনের মাদকতার উন্মত্ত লম্ফনের রসিকতা সযত্নে পরিহার করে ধীর অথচ সক্রিয় পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সঙ্গে অন্বীক্ষার ঐকান্তিক সমন্বয়ে উভয়ের মূলগত ঐক্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে।

বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের ভারসাম্য ব্যাহত হলে ক্ষণপ্রভ আলোক বিচ্ছুরিত হয় কিন্তু তার সম্ভাব্যতা অন্তরাশ্রয়ী; কল্পনাও সেইরকম ব্যক্তির চিত্তে প্রকৃতি ও সমাজের বিরোধজনিত সমস্যার ক্ষেত্রে

সহজ সমাধানের অভাব সূচিত করে। সমস্যার সমাধানে পূর্ণচ্ছেদ না পড়া পর্য্যন্ত কল্পনার বিশ্রামের অবসর নাই। কালিদাসের যক্ষের মেঘের চেয়েও কল্পনার অক্লান্ত পক্ষবিস্তার বিরতিহীন। এমন কি, অলকায় উত্তীর্ণ হলেও তার পক্ষবিধূনন ক্ষান্তিলাভের অধিকারী নয়; যক্ষপত্নীর নির্দ্দিষ্টপথে পক্ষসঞ্চার করে আবার তাকে নবরামগিরি পর্ব্বতে যক্ষের কাছে ফিরে এসে সদ্য শাপমুক্তির নূতনতম গুপ্ত সঙ্কেতটী নিবেদন করতে হবে। যক্ষের শাপমুক্তির ফলে কেবল প্রিয়ার সঙ্গে মিলন নয়, কর্ম্মজীবনের সঙ্গে যোগ পুনরায় স্থাপিত হলে তবে তার গতিচঞ্চল পক্ষপুটের সাময়িক অবসর ঘটবে, তার পূর্ব্বে নয়।

বাস্তব জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে যে সমস্যার সৃষ্টি করে, সাহিত্যকে তার পরিচয় দিতে হয় বলেই, সাহিত্যিক কেবলমাত্র অবাস্তবকে বর্জ্জন করেন, তা নয়; সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার সাহায্যে সে সমস্যার সমাধানের চেষ্টাও তাঁকে করতে হয়। কারণ, যত সমস্যার সৃষ্টি হয়, তত সমস্যার সমাধান ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ করে সাহিত্যের আসরে উপস্থাপিত করা লোকোত্তর সাহিত্যিকের পক্ষেও অসম্ভব। সুতরাং কল্পনার সঙ্গে সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য যোগ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কল্পনার বন্ধহীন আতিশয্য অনেক সময় মনকে সমস্যা থেকে সমস্যান্তরে বিভ্রান্ত করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়; তার ফলে যে সমস্যার সমাধানের তাগিদে কল্পনার প্রয়োজন হয়েছিল, স্বৈরিণী কল্পনা সে উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়ে অবাধ অনুষঙ্গে ক্লান্তিনীল মৃত্যুর পথে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে।

শেষোক্ত কল্পনা সর্ব্বদাই সুস্থতার সীমারেখা অতিক্রম করে, কখনও কখনও ঘোর বিকারের অবস্থায় পর্য্যন্ত পৌঁছায়। মানুষের কল্পনায় এ রকম বিকারের লক্ষণ দেখা দিলে তাকে উন্মাদ পর্য্যায়ে ফেলা হয়, কিন্তু সমাজের দুর্ভাগ্যবশত ও বিকারগ্রস্ত সাহিত্যিকের সৌভাগ্যবশত সাহিত্যে এ রকম লক্ষণ উপস্থিত হলে তাকে নূতন টেকনিক বা আঙ্গিক আখ্যা দিয়ে লোকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করা হয়। সাহিত্য গণিত বা বিজ্ঞানের মত নয়; সুতরাং তার আঙ্গিক বিষয়বস্তুনিরপেক্ষ হতে পারে না। এমন কি বিজ্ঞানের আঙ্গিকও পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হয়। আর গণিতের বেলায় পরীক্ষা না থাকলেও পরস্পর অবিরুদ্ধতার সাষ্ঠিক সামঞ্জস্যের মাপকাটীতে তার আঙ্গিকের বিচার হয়। কিন্তু কাব্য ও উপন্যাসে এ শ্রেণীর টেকনিক বা আঙ্গিকের স্থান কত দূর আছে তা সন্দেহের বিষয়। অবশ্য ভাষার সৌন্দর্য্য বা ধ্বনির মাধুর্য্য রসাত্মক বাক্যের সঙ্গে আত্যন্তিকরূপে সংপৃক্ত; কিন্তু শুদ্ধ ভাষাশিল্পের পরীক্ষার ক্ষেত্ররূপে সাহিত্যকে গ্রহণ করা যায় না। ভাষাশিল্প কারুকার্য্য মাত্র; কারুকার্য্য কখনও স্বয়ংসিদ্ধ ও আত্মসম্পূর্ণ হতে পারে না। পটভূমি অনুযায়ী তার রূপান্তর ঘটে। পটভূমির বন্ধন পরিত্যাগ ক'রে ভাষাশিল্পের মুক্তিলাভের চেষ্টা জলচর মৎস্যের পক্ষে জলের বন্ধন ত্যাগ করে স্বাধীনতা লাভের মতই করুণ।

এ জাতীয় বিকৃত কল্পনার কথা ছেড়ে দিলে, সাহিত্য বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার যোগ স্থাপন করে। লোকায়ত সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্খার বৈচিত্র্য অন্তহীন। সমাজের বিশিষ্ট অবস্থার পটভূমিতে এই বেদনা যে রূপ ধারণ ক'রে নূতন পরিস্থিতি ও সমস্যার সৃষ্টি করে, তার সর্ব্বাঙ্গীন সমাধান কোন সাহিত্যিক নিজের বা অন্যের

বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার অল্প পরিসরের মধ্যে অনুভব করতে পারেন না; কিন্তু কল্পনা এখানে তাঁকে পথ দেখায় ও সমাধানের ইঙ্গিত প্রদান করে। সুস্থ ও সাবলীল কল্পনার অঙ্গুলিসঙ্কেতে সাহিত্যিক তাঁর সমস্যার সমাধানের প্রেরণা পান। কিন্তু এ ইঙ্গিত যে আলেয়ার আলো নয় তা সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে বুঝতে পারেন। কারণ সমাজের পরিবর্ত্তনশীল ঐতিহাসিক জীবনের ধারা অতীন্দ্রিয় অদৃষ্ট শক্তির লীলাক্ষেত্র নয়; ধনোৎপাদন ও ধনবণ্টনের পদ্ধতি ঐতিহাসিক ধারার নিয়ামকরূপে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং সমাজের মানুষের সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্খা যে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির রূপায়িত সমস্যা, তার সমাধানের জন্য কল্পনার অঙ্গুলিনির্দ্দেশ ঐতিহাসিক অগ্রগতির পূর্ব্বসঙ্কেতরূপে গ্রহণ করা যায়। কারণ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে সাহিত্যিক কল্পনার শুভদৃষ্টি ঐতিহাসিক ভবিষ্যতের গতিপথের দিকে বদ্ধলক্ষ্য না হয়ে পারে না। ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনের পরিণত ফল বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও সাহিত্যিক কল্পনা উভয়েরই কাম্য।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সার্ব্বজনীনতার মত কল্পনারও একটা সার্ব্বজনীনতা আছে। কল্পনার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পূর্ব্বসঙ্কেত মাত্র। ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনের সার্ব্বজনীনতা কল্পনার পূর্ব্বসঙ্কেতের মূর্ত্তিতে সাহিত্যিক দেখতে পান; কিন্তু বৈজ্ঞানিক যেমন কাল্পনিক সমাধানে সন্তুষ্ট না হয়ে যেখানে সম্ভব বাস্তবিক পরীক্ষা করে দেখেন, অথবা অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিধির সঙ্গে এই কাল্পনিক সমাধানের সামঞ্জস্য স্থাপন করতে চেষ্টা করেন, সাহিত্যিককেও তেমনি কাল্পনিক সমাধানকে যেখানে সম্ভব ইতিহাসের নজিরের সঙ্গে বা আগম্যমান বিশিষ্ট সামাজিক পরিবর্ত্তন

এসে উপস্থিত হলে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। যেখানে সমস্যার ঐতিহাসিক সমাধানের বিলম্ব থাকবে, সেখানে তাঁকে অন্যান্য ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধির সঙ্গে তাঁর কাল্পনিক সমাধানের সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করতে হবে। সাহিত্যিক সামাজিক অগ্রগতির কাজে সহায়তা করতে পারেন যদি তিনি সার্ব্বজনীন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কাল্পনিক দৃষ্টিকোণকে সংযুক্ত করে ইতিহাসের সমগ্র রূপের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য স্থাপন করেন।

যদি সন্দেহ হয় যে সমস্যার সমাধান হলেই যখন কল্পনার প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে, তখন কল্পনাকে সার্ব্বজনীন বলা ভুল, তবে তার উত্তরে এই বলা যায় যে প্রকৃতি, সমাজ ও ব্যক্তির পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতে এত বেশী ও এত বিচিত্র সমস্যার উৎপত্তি হয় যে, তাকে অনন্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না; সুতরাং প্রত্যেকটি সমস্যা সমাহিত হয়ে নূতন সমস্যা ও প্রশ্নের অবতারণা করে। ফলে মানুষের চিরন্তন সমাধানপ্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তনী কল্পনাও অব্যাহত থাকে। অতএব সাহিত্যেরও প্রয়োজন কখনো নিঃশেষিত হয় না। বিজ্ঞান ও সাহিত্য, বুদ্ধি ও কল্পনা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে সমাজের ঐতিহাসিক অগ্রগতির যাত্রাপথে মানুষের মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। একমাত্র ফ্যাশিজম্ ও যুদ্ধের বর্ব্বর উপদ্রব বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অগ্রগতির পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। বিষবাষ্প ও অন্যান্য রণসম্ভারসৃষ্টির কাজে বিজ্ঞানের অশুভ প্রয়োগ, স্পেনের সমরপ্রাঙ্গনে র‍্যালফ্ ফক্সের মত সাহিত্যিকের প্রাণদান, ও আঁদ্রে মালরোর ফ্যাশিষ্ট বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে ও সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বপক্ষে যুদ্ধে যোগদানের বেদনাময়

ঘটনা বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পক্ষে অত্যন্ত অশুভ ও সর্ব্বনাশকর। এ দেশে যাঁরা ফ্যাশিষ্টপন্থী আছেন, তাঁদের নিয়ে আমাদের সাহিত্যিকেরা বার্ণার্ড শ'র প্রস্তাবিত "জেনেভ"এর মত একখানি বই লিখলে উপভোগ্য হবে বলে মনে হয়।

এই আসন থেকেই আচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বলেছেন যে সাহিত্য সমাজবিশেষের হৃদগত প্রতীতির অভিব্যক্তি ; তাঁর কাছে আমার মত ক্ষুদ্র শিষ্যের সশ্রদ্ধ নিবেদন এই যে চিন্তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য বিশুদ্ধ হৃদয় নিষ্পাপ আদিম অবস্থার মতই অবাস্তব। প্রতীতির অন্তর্লীন কল্পনা বুদ্ধিগত সমস্যাসমাধানের পূর্ব্বরূপ মাত্র। সমাজবিশেষের হৃদয়গত প্রতীতির সাহিত্যিক অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে লব্ধ ঐতিহাসিক বিধির সার্ব্বজনীনতাও স্বীকার করা প্রয়োজন। নচেৎ বৈশিষ্ট্যের আতিশয্য কূপমণ্ডুকতায় পরিণত হয়ে সাহিত্যের দৃষ্টি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও অনুদার দেশাচারের গণ্ডিতে আবদ্ধ হবার আশঙ্কা আছে। সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সমস্যার মূলগত সার্ব্বজনীনতার ভিত্তিতে সমস্যাসমাধানের পূর্ব্বসঙ্কেতরূপ কল্পনার সার্ব্বজনীনতাও স্বীকার্য্য। যদি বিশিষ্ট সমাজ সম্পূর্ণ স্থিতিশীল ও অন্য সমাজনিরপেক্ষ হতো তবে শুদ্ধ বৈশিষ্ট্যকে সাহিত্যের প্রাণরূপে গ্রহণ করতে আপত্তির কারণ থাকতো না। কিন্তু ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনের অবিরাম গতির ফলে পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর স্রোতোবেগে চালিত উপলখণ্ডের মত কোন বিশিষ্ট সমাজের একান্ত বৈশিষ্ট্য চিরস্থায়ী থাকতে পারে না। কিন্তু সার্ব্বজনীনতার অবিরুদ্ধ বৈশিষ্ট্য সমাজে ও সাহিত্যে সম্পূর্ণ

গ্রহণযোগ্য। সার্ব্বজনীন ভূমির উর্ব্বর প্রাচুর্য্যে পরিপুষ্ট সাহিত্যের বিশিষ্ট রসই সামাজিক মানবের বুদ্ধি ও হৃদয়ের উপজীব্য।

বাঙ্গালীর কল্পনাপ্রবণ জাতি বলে যে সুখ্যাতি বা অপবাদ আছে তার মূলে আছে সাহিত্যপ্রীতি। বাঙ্গালীর সাহিত্য আজ বিশ্বের দরবারে তার সম্মানিত স্থান গ্রহণ করেছে। যে সমস্ত শক্তিমান ও প্রতিভাশালী লেখকের ঐকান্তিক চেষ্টার পরম্পরার ফলে বাঙ্গালার সাহিত্যের এ গৌরবলাভ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সৃষ্টি কাল্পনিক ও বাস্তব সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ও শোভন। কিন্তু তাঁদের সম্মানিত পদে প্রণাম জানিয়ে সাহিত্যিকদের উপলবন্ধুর ও বিঘ্নসঙ্কুল যাত্রাপথে অভিযান করতে হবে। স্থিতিশীল জড় বাস্তবতা বা নভোচারী মুক্তপক্ষ কল্পনা দুরারোহ পার্ব্বত্যপথ অতিক্রমের উপযুক্ত পাথেয় নয়। বাস্তব ও কল্পনার যৌগিক রসায়ন বাঙ্গালা সাহিত্যকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করে দুর্গম অগ্রগতির পথে আপনাদের চিত্তে নবজীবনের শক্তি সঞ্চার করুক, এই আমার একমাত্র কামনা। *

---

* শ্রীরামপুর "বনফুল সাহিত্য সমিতির" অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

দুই কবি

বিভা বসু

সিঁদুর রঙের মত
গোলাপ ফুটেছে কত
ভ্রমরে জানাতে তায়
বাতাস ছুটিয়া যায়।

"ঘোমটা খুলেছে বধূ,
বক্ষে ধরেছে মধু,
অধরে মেখেছে ফাগ,
অঙ্গে ঝরে পরাগ!"

সোহাগে ভ্রমর ছুটি
গোলাপ বক্ষে লুটি
চুমায় চুমায় ভরি
মধুটি লইল হরি।

কহিছে প্রথম কবি—
আহা কি প্রেমের ছবি!
গোলাপ ভোমরা-বধূ,
ভ্রমর গোলাপ-বঁধু।

রুখিয়া দ্বিতীয় কবি
কহিল মিথ্যা সবি,
এ নহে প্রেমের কথা,
শুনেছি গোলাপ ব্যথা।

ঢালিয়া রক্ত শুধু
গোলাপ গড়েছে মধু,
রেখেছে যতন করি
কোমল বক্ষে ধরি।

পায়েতে দলিয়া ফুল,
বুকেতে ফুটায়ে হুল,
শুষেছে গোলাপ খুনই
ডাকাত ভোমরা খুনী।

দারুণ বিষের জ্বালা,
কাঁদিছে গোলাপবালা—
ওরে ও অন্ধ কবি,
এই কি প্রেমের ছবি?

ফাঁপা মানুষ

(বুড়ো মোড়লকে কাণা কড়ি)

টি, এস্, এলিয়ট

[বিষ্ণু দে অনূদিত]

* The Hollow Men কবিতার অনুবাদ। *

১

আমরা সব ফাঁপা মানুষ
আমরা সব ঠাসা মানুষ
ঠেস্ দিয়ে' ঢলে' পড়েছি এ ওর গায়ে
মাথার খুলি খড়ে ঠুসে'! হায়রে!
যখন ফিসফিসিয়ে' আলাপ করি
আমাদের শুক্‌নো গলা শোনায়
শান্ত অর্থহীন
যেন শুক্‌নো ঘাসে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস
কিম্বা যেন আমাদের সরাবখানার ফাঁকা ভাঁড়ারে
ভাঙা কাচের উপর ইঁদুরের আনাগোনা

রূপহীন কিমাকার, বর্ণবিহীন ছায়া,
পক্ষাঘাতগ্রস্ত বেগ, অঙ্গভঙ্গী নিশ্চল;

যারা পার হয়
প্রত্যক্ষ নয়নে যারা মরণের পরপারে যায় অলকায়
তারা আমাদের মনে রাখে—যদি রাখে
ভ্রান্ত ভ্রষ্ট দুর্দ্দম জীব বলে' নয়
মনে রাখে শুধু
ফাঁপা মানুষ
ফাঁকা মানুষ বলে'।

২

স্বপ্নেও যে চোখগুলির চোখোচোখি দ্বিধা লাগে
মরণের স্বপ্ন অলকায়
তাবা আসে নাকো :
সেখানে সে চোখগুলি নিষ্পলক জাগে
খর রৌদ্র যেন ভাঙা মর্ম্মরের স্তম্ভের গায়ে
সেখানে একটা গাছ অবিশ্রাম দোলে
আর কণ্ঠস্বরগুলি মনে হয়
বাতাসের করতালে খোলে
নিভন্ত নক্ষত্রের চেয়ে
আরো দূর আর আরো গম্ভীরতন্ময়।

চাইনা আর যেন যাইনা আরো কাছে
মরণের স্বপ্ন-অলকায়
আমিও যেন পরতে পাই বেছে বেছে
ছদ্মবেশ

ইঁদুরের জামেআর, পরচুলা কাকের পালক
কাগতাড়ুয়ার লাঠি আড়াআড়ি হাতে
পোড়ো ক্ষেতে
কাজ—যা করায় হাওয়াতে-
আরো কাছে নয়

সে চরম সম্মিলন নয়
সন্ধ্যা অলকায়।

৩

এই ত শ্মশানদেশ
ফণিমনসার দেশ
পাষাণের মূর্ত্তিগুলি
এখানে স্থাপিত এই, এখানে তারা পায়
মৃতেব হাতের কাতর মিনতি
নিভন্ত নক্ষত্রের নশ্বর জ্বলে' ওঠায়।

সে কি এম্‌নিতর
মরণের সেই অলকায়
সঙ্গীহীন জেগে উঠে'
যখন মাধুর্য্যে বিধুর কাঁপি থরথর
ওষ্ঠাধর চুম্বনে উদ্যত
আচম্বিতে ভাষা পায় প্রার্থনায় ভাঙা পাষাণের পায়ে লুটে।

২

এখানে সে চোখগুলি নেই
কোনো চোখই নেই
এই ম্রিয়মাণ নক্ষত্রের উপত্যকায়
এই শূন্য উপত্যকায়
আমাদের এই ভ্রষ্ট রাজ্যের ভগ্ন জম্বু-জাম্বুতে

সম্মিলনের এই শেষ মেলায়
আমরা সব হাৎড়ে হাৎড়ে মরি
আর আলাপের মুখ চেপে ধরি
জড়ো হয়েছি সবাই
শোথস্ফীত এ নদীর বালুকাবেলায়

দৃষ্টিহীন, যদি না
সেই চোখগুলি আবার আসে
ধ্রুবতারা যেন আকাশে
শতদল স্বর্ণকমল
মরণের সন্ধ্যা অলকার
ফাঁকা মানুষের
একটি মাত্র আশা।

৫

ইকৃড়ি মিকৃড়ি চামচিকৃড়ি
কাঁকড়ার দল চলে
ইকৃড়ি মিকৃড়ি চামচিকৃড়ি
মাকড়সা দেয়ালে

ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চিম্‌সে পাখা
চামচিকেরা মেলে
শ্যাওড়া-কাঁটায় ভোর চারটেয়
ছেলেরা সব খেলে।

প্রত্যয় আর প্রত্যেকের মধ্যে
প্রবৃত্তি আর কার্য্যের মধ্যে
পড়ে কালছায়া
প্রভু তোমারই ত সব মায়া

ধারণ আর সৃষ্টির মধ্যে
আবেগ আর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে
পড়ে কালছায়া
এ জীবন দীর্ঘ অফুরান

বাসনা আর তৃপ্তরতির মধ্যে
বীজ আর সত্তার মধ্যে

তত্ত্ব আর অবতারের মধ্যে
পড়ে কালছায়া
প্রভু তোমারই ত সব মায়া

প্রভু তোমারই
এ জীবন
প্রভু তোমারই ত সব

এই চালে ভাই দুনিয়ার শেষ
এই চালে ভাই দুনিয়ার শেষ—
দীপ্ত বজ্র নির্ঘোষে নয়
নেড়ী কুকুরের নাকী কাঁদায়।

'অনুরাধা' নাটকের

প্রস্তাবনা

বুদ্ধদেব বসু

রাত্রি হ'য়ে এলো শেষ। ধূসর মসৃণ
পথ শূন্য পড়ে' আছে, যেন অন্তহীন
প্রতীক্ষার দীর্ঘদৃষ্টি অপলব চোখে
পার হ'য়ে পৃথিবীর সবুজ আলোকে
মিশে গেছে সময়ের সুরঙ্গ-গহ্বরে।
নির্ভুল নিয়মে অনুসরি পরস্পরে
পড়ে' আছে যুগ্ম ট্র্যাম-লাইন, ক্লান্তিকর
অফুরন্ত ছন্দে বাঁধা সমিল পদ্যের
মতো; ম্লান গ্যাসালোক স্খলিত মদ্যের
মতো জ্বলিছে নির্জ্জন অ্যাস্‌ফল্টের 'পর
পিচ্ছিলচ্ছটায়। রাত্রি হ'য়ে এলো শেষ;
প্রাক্‌-প্রভাতী মুহূর্ত্তের ভঙ্গুর স্তব্ধতা
ক্ষণতরে ঢেকে আছে সব ক্ষত, সব জ্বালা, ব্যথা
ভয়, আশা, অভিশাপ, উল্লাস, সংশয়
আঁকাবাঁকা কলকাতার। নিদ্রিত নগর
এ-মুহূর্ত্তে। পেয়েছে কি স্বপ্নের আশ্রয়
এতক্ষণে যত ভাঙ্গা বুক? লোভে পীত
মৃত যত চোখ, বাসনার অনশ্বর

মোহে ম্লান যত চোখ, নিদ্রার নিভৃত
মর্ম্মরিত অন্ধকারে পেলো কি বিশ্রাম ?
মাতৃ-গর্ভ স্নেহ মধ্যে পেলো কি আরাম ?

এতক্ষণে শেষ হ'লো নগর-গর্জ্জন,
এখনি আরম্ভ হবে নগর-গর্জ্জন।
মুহূর্ত্তের স্বপ্ন-সেতু করে' দেবে পার
তীব্র উন্মত্ততা থেকে তীব্র মত্ততায়।
এখন নিঃশব্দ সব। ক্লান্ত গণিকার
সুরা-ক্লিন্ন কণ্ঠের বিলোল সঙ্গীত
মূর্চ্ছায় বিলীন হ'লো। গোপন খাতায়
কী-কথা লিখিতে গিয়া যুবক-কবির
দৃষ্টিতে ফুটিলো কার দৃষ্টির ইঙ্গিত,
তারপর ঘুম আর নেই তার। সে-ও
জাগর স্বপ্নের শেষে নিদ্রার নিবিড়
স্বপ্নে ডুবে আছে, এখন নিঃশব্দ সব।
রাত্রির সমুদ্র ভরে' ওঠে যত ঢেউ
রাত্রির হৃদয়ে বাজে যত স্তব্ধ রব
রাত্রির আকাশে যত রহস্যের ছায়া
নগরের শরীরেরে রয়েছে আবরি
এ-অস্থায়ী মুহূর্ত্তের চঞ্চলতায়।

এ-অস্থির নগরের প্রগল্ভতায়
রাত্রি কি রাখিবে ঢেকে ? গেলো বিভাবরী,

ভোর হ'লো বলে'। এ-প্রভাতে নেই মায়া,
এ-প্রভাত নিতান্তই নীরস কর্কশ
দিবসের আপিসের অমোঘ আহ্বান।
এ-প্রভাতে ঘরে আসে খবরের কাগজ
চায়ের পেয়ালা থেকে ভাতের থালায়
গৃহিণী হাঁপিয়ে ওঠে; মুখে দিয়ে পান
ইস্ত্রীহীন পাৎলুনের বেলুন উড়ায়ে
মলিন চাদরে তুলে পেট-মোটা পাল
বাস-ট্র্যাম ভর্ত্তি করে' ছোটো দলে-দলে
ভিড়ে ভর্ত্তি করে' গেলো প্রশস্ত দিবস
ভর্ত্তি করে' গেলো সব সঙ্কীর্ণ মগজ
পলিটিক্সি ফুটবল টাকা ও কুৎসায়।
পলিটিক্স ক্রস্ওয়ার্ড ক্রিকেট কুৎসায়
টাকা-অতিরিক্ত শ্রম সহাস্যে ফুরায়ে
মন্ত্রপূত দাম্পত্যের জীর্ণ শয্যাতলে
ফিরে এসে ভাবো মনে এর পর কাল।

এর পর কাল আর এর পর কাল
আসিলো কল্‌কাতার আরো এক কাল
আসিলো কল্‌কাতার আরো এক দিন
চেয়ে দ্যাখো কল্‌কাতার আরো এক সকাল।
ভবানীপুরের এক গৃহের দ্বিতলে
সুগন্ধি নরম শুভ্র শয্যায় বিলীন
অনুরাধা রায়। ঘুমায়ে কি রয়েছে সে?

অথবা কি আত্ম-প্রতারক স্বচ্ছ ছলে
শুয়ে আছে চুপ করে' ঘুমের মতন ?
শুয়ে আছে স্তব্ধ হ'য়ে মৃত্যুর মতন ?
স্বপ্ন তার ছিঁড়ে যায় কোন্ সর্ব্বনেশে
ধারালো ব্যথায়। কী কথা পড়িয়া মনে
চেতনা মুহূর্ত্ত তার তীব্র নিষ্পেষণে
ছিন্ন হ'তে চায়। প্রত্যাগত জাগরণে
হানা দেয় চাপা বিদ্যুতের বিস্ফোরণ,
হানা দেয় হৃৎপিণ্ডে আশঙ্কা সংশয়—
কী নিষ্ঠুর রূঢ় ক্রূর এই জাগরণ
যেখানে চেতনা চেয়ে ভালো মনে হয়
ঘুম ; সব চিন্তা, সব ইচ্ছা, আশা চেয়ে
ভালো লাগে ঘুম ; আর যদি এই ঘুম
মৃত্যুর সমুদ্রে মেশে, সব চেয়ে ভালো
মনে হয়। যেথা নেই ছায়া আর আলো,
কর্ত্তব্য দায়িত্ব নেই, স্বপ্নের কুসুম
মরে' যায় বন্ধ্যা কালো জলে, স্রোত বেয়ে
পথিক-আশার নৌকা আসে না ত্বরিতে
মগ্ন গিরিশৃঙ্গে ঠেকে সহসা মরিতে।
যেথা দ্বিধা নাই, যেথা বাধা নাই, নাই
স্বপ্ন আর প্রাপ্তব্যের শাশ্বত বিরোধ,
ইচ্ছা আর কর্ত্তব্যের মহৎ বিরোধ,
প্রজ্ঞা আর প্রবৃত্তির কুটিল বিরোধ ঃ
মৃত্যু সব চেয়ে ভালো, সেথা কিছু নাই।

তবুও জাগিতে হয়, সংশয়েরে মুখোমুখি
তাকায়ে দেখিতে হয়। কঠিন সঙ্কটে
হৃৎপিণ্ডের গ্রন্থিমাঝে নগ্ন অকপটে
বেঁধে নিতে হয়। বুক ছিঁড়ে যায়। উঁকি
দেয় হাজার ভয়ের প্রেত, তবু তার
রক্ষা নাই; আছে দ্বিধা, আছে বাধা, আছে
কর্ম্ম আর কল্পনার শাশ্বত বিরোধ
সত্তা আর ব্যক্তিত্বের মহৎ বিরোধ
দৈব আর প্রতিজ্ঞার কুটিল বিরোধ।
এর মধ্যে কোথা পথ? নিয়তির ভার
যতই দুঃসহ হোক্ বহিতেই হবে।
আজ তাই অশ্রুজলে দেবতারে যাচে
যাচে দিনে যাচে রাত্রে, যাচে স্তব্ধ স্তবে
দ্বিধা-দ্বিখণ্ডিত-চিত্ত অনুরাধা রায়
বড় প্রয়োজন তার দেবতা-দয়ায়।

প্রশ্ন

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ভগবান, ভগবান, রিক্ত নাম তুমি কি কেবলি ?
নেই তুমি যথার্থ কি নেই ?
তুমি কি সত্যই
আরণ্যিক নির্ব্বোধের ভ্রান্ত দুঃস্বপন ?
তপন্ত তপন
সাহারা গোবির বক্ষে জ্বলেনা কি তোমার আজ্ঞায় ?
চোখের ইঙ্গিতে তব তমিস্রা করাল
ভরাক্রান্ত গগনেরে করেনা কি স্বচ্ছন্দে নিক্ষেপ
উন্মত্ত, উদ্বেল আংলান্তিকে ?
স্তব্ধ গৌরীশঙ্করের বুকে
দিগম্বরী ঝঞ্ঝা, সে কি বাজায়না তোমার বিষাণ
তাণ্ডবের উন্মথ হিন্দোলে ?

ক্ষমা ! ক্ষমা ! ক্ষমিতে কি জানিনা আমরা ?
মোরাও কি অন্যমনে তাকাই না নীরব আকাশে
অসিধৃত বাহুবলে যবে
বিচ্ছিন্ন হৃদয় লয়ে করে তুচ্ছ খেলার কন্দুক ?

দেখি না কি মোরা নির্ব্বিবাদে
লুব্ধ দুঃশাসন
কামার্ত্ত সভার মাঝে কেড়ে নেয় বুকের বসন
অসূর্য্যম্পশ্যরূপা পরাণপ্রিয়ার ?
নিরিন্দ্রিয় অহিংসার ব্রতে
মোরা কি যাইনা ছুটে কষাহত গড্ডলিকাসম
রক্তলোভাতুর যূপে পাতিবারে নিরীহ মস্তক ?
আমাদের অপৌরুষ করেনা কি ক্ষমা
গৃধ্নু নিষাদের হাতে বারম্বার তোমার নিপাত ?
মোরা কি জানিনা
তিতিক্ষা মার্জ্জনা,
সে কেবল
নিরুপায় নির্জ্জিতের স্বগত প্রবোধ,
অক্ষমের অন্তিম সম্বল ?

যাযাবর আর্য্যের বিধাতা,
হুঙ্কৃত পিনাক আজ বিরাজে কি ইন্দ্রধনু মাঝে ?
মৃত্যুঘন প্রগল্‌ভ দম্ভোলি
পরিণত অমায়িক কুসুমসায়কে ?
কেবলি কল্যাণ !
কেবলি কল্যাণ !
শুধু ধৈর্য্য !
অন্তহীন সহিষ্ণুতা শুধু !
অদৃশ্য, অস্পৃশ্য শূন্য হতে

কিন্নরীনিন্দিত কণ্ঠে কম্র, কম্প্র করুণার বাণী—
ক্ষমা করো,
ক্ষমা করো দুর্ব্বৃত্তের জিঘাংসু অজ্ঞান !

হায়, ভগবান
হায়, হায়, ব্যর্থ ভগবান,
তোমার অমিত ক্ষমা, সে কি শুধু অসুরের তরে ?
কিন্তু যারা প্রহরে প্রহরে
উৎসর্গিছে অকাতরে অতিমূল্য প্রাণ
সুপ্রতিষ্ঠ করিবারে মরলোকে সিংহাসন তব,
তারা অবজ্ঞার পাত্র ?
তারা নয় আত্মীয় তোমার ?
যারা সব ত্যজি,
আপন ধমনী ছেদি সিঞ্চিয়াছে রুক্ষ মরুভূমি
অঙ্কুরিতে সোনার স্বপন,
নাই তাহাদের দাবি ও-কৃপণ করুণাকণায় ?
তৃষিত বালুতে
সদ্গতি-সংকারহীন তাহাদের শব
শকুনির ভোজ্যমাত্র ?
তাহাদের সহিষ্ণু কঙ্কাল
সর্ব্বংসহা ধরণীর বর্দ্ধমান জঞ্জালের বোঝা ?

এ নিষ্ঠুর অপচয়
এর পাছে আছে অভিপ্রায়

আছে কি আকৃতি ?
হেথা যারা পরাজিত বৈকুণ্ঠে তাদের হবে জয় ?
তোমার স্মারকস্তম্ভে অমর অক্ষরে
লেখা রবে তাহাদের নাম ?
নাম—শুধু নাম !

কোন্ ফল সে-অমৃতে ?
পারিবে কি তাহা ফিরে দিতে
পৃথিবীর জল-বায়ু, রৌদ্র-ছায়া, সিদ্ধি ও সাধনা ?
ধ্বংসশেষ প্রমোদের কণা
অখণ্ড হবে কি পুন সে-দিব্য পরশে ?
অনন্তের সঞ্জীবনী রসে
মিলিবে কি প্রতিদান
উপেক্ষিতা পার্থিবার মুখমদিরার ?
হায়, ক্ষেমঙ্কর,
অজস্র মঙ্গল তব পারিবে কি করিতে সুন্দর
অবরুদ্ধ যৌবনের জীবন্ত মৃত্যুরে ?
আজিকে আর্তের কাছে পারিবে কি করিতে প্রমাণ
নও তুমি নামমাত্র ;
তুমি সত্য, তুমি ধ্রুব, ন্যায়নিষ্ঠ তুমি ভগবান ?

স্লেটের লেখা

সজনীকান্ত দাস

মনের খেয়ালে একদিন আমি তুলিয়াছিলাম ছবি—
মনের ক্ষুধার অসংখ্য ফটোগ্রাফ,
ছাড়া ছাড়া সব যতনে হেলায় তোলা—
সবারে মিলায়ে মালা গাঁথিবার ছিল না সূত্রখানি,
আমি ছিনু ছেঁড়া-ছেঁড়া।
কখনো শহরে কভু অরণ্যে কখনো গাঁয়ের হাটে
ছলছল জল কখনো নদীর তীরে
উপলমুখর ঝরণার কূলে কূলে
রুক্ষ গিরির শিখরে সঙ্গীহীন
সহসা-শৈলবিদারী প্রপাতমূলে
কখনো ইহার কখনো উহার সাথে—
পশ্চাতে কভু মেঘমায়া ঘেরা গম্ভীর পটভূমি
কভু নবশ্যাম দেবদারু-কিসলয়।
আকাশে ছড়ানো নক্ষত্রের মত
ছাড়া ছাড়া তবু রাশিচক্রের মূর্ত্তি রচনা করি
জড়াইয়া তারা ছিল যে পরস্পর।
গগন-ললাটে গেঁথে ভুলিবার ছিল নাকো বন্ধন,
মনের আকাশে আজিও তাহারা তেমনি ছড়ানো আছে।

মনের আবেগে একদিন আমি আঁকিযাছিলাম ছবি—
বর্ণে বর্ণে অপরূপ সেই পুরাতন ছবিখানি
দেয়ালে কখন রেখেছি টাঙায়ে সে তোলা-ছবির দলে ;
তেমনি করিয়া কাচ-আবরণে কাঠের ফ্রেমেতে বাঁধি
কবে যে রেখেছি কবে যে ভুলিয়া গেছি—
হাতে আঁকা ছবি এক হয়ে কবে মিশিযাছে ফটোগ্রাফে।
আনমনে কত অভ্যাসবশে ধুলা ঝাড়িবার ছলে
সমান আদর করিয়াছি দুইবেলা।
কখনো দেখি নি কাঁদিযাছে ছবি বর্ণের অভিমানে,
ছিঁড়িয়া পড়েছে ভুঁয়ে।
যে আবেগ আব যে বেদনা যেই বেদনা-মথিত সুখ
আমার মনের নিভৃত কোণের যে শঙ্কা শিহরণ
বর্ণে বর্ণে ছবির আকারে একদা ধরেছে রূপ,
সহসা কখন হারাইয়া গেছে রূপহারাদের দলে।
ভাবিতেছি বিস্ময়ে
মনের আবেগ ছবির আকারে অগ্নি-গিরির বেগে
আঁধার আকাশে আবার কখনো হবে কি উৎসারিত ?

মনের খেযালে একদিন আমি কেবল কয়েছি কথা
কথার উপরে কথা সে যেন বে তুবড়ি ফোটায় ফুল—
বাঁচিতে বসিয়া মরিতে চাওয়ার কথা
মরিতে বসিয়া কাঁদিয়া ভাসানো গাল—
বাঁচা আর মরা, মরা আর কাঁদা—সকল খেলার শেষে
দ্বিগুণ সোহাগে বুকেতে চাপিয়া ধরা।

কাঁচের গেলাস ভেঙে করে ঝন্‌ঝন্‌,
তরী ডুবে যায় নীরব প্রেমেতে তলহীন বারিধির ;
ঘুড়ি আর পাখী সমানে আকাশে ওড়ে—
হাতের লাটাই সুতার বাঁধনে অবিরাম কহে কথা,
পাখীর পাখায় নাই শিকলের ভাষা।
কথা আর কথা, কেবলই কথার মায়া—
"তোমার পরশে জীবন-সাগরে জেগেছে জোয়ার মম
হইয়াছি উদ্বেল,
আরো কাছে এস, দূর আকাশের শশী!"
কথা কই আর আমি নিজে কাছে যাই।
কথা-কওয়া-ভুল এমনই ঘটেছে কত—
মূক হওয়া মুখ মুখর হয়েছে পুনঃ
মরণোন্মুখ মানবের মুখে কথা ছোটে অবিরল,
সকল বলার তবু হয় নাকো শেষ,
বুকেতে আমার হাহাকার করে আজও অকথিত কথা!

মনের আবেগে একদিন আমি গাহিয়াছিলাম গান
কথাহীন শুধু একটিমাত্র সুর—
তার রেশ আজ পাই না খুঁজিয়া মোর ভোলা ত্রিভুবনে
—কলকোলাহল স্পন্দিত ত্রিভুবন ;
তরঙ্গ তার জানি তবু দোলে নভোনীলিমার পারে
ধরার বাতাস শূন্যে যেথায় লীন,
সেথা হতে পুনঃ ফিরিয়া ডাকিতে তারে
ব্যাকুল পাখায় ছুটিয়া ছুটিয়া ক্লান্ত হয়েছে মন,

পায় নি নাগাল তার।
ছিন্নপক্ষ ভূমে পড়িয়াছে—ধরার তৃষিত ধূলি
নিবিড় বাঁধনে বাঁধিয়া তাহারে কহিয়াছে কানে কানে—
"ক্ষণিকের গান, আমি যে চিরন্তন,
আমার বুকেতে ফলাবে ফসল তোমার কামনা-বীজ
মৃত্তিকা ফুঁড়ে আলোর আকাশে প্রথম তুলিবে শির,
অপরূপ স্বর তাহার দ্বিদল মাঝে,
তার সেই স্বরে গান গাবে চরাচর।
ক্লান্ত পথিক, শোন গো পাতিয়া কান
হারানো তোমার গান যে বেসুর জমানো গানের কাছে!"
ভুলিয়া গিয়াছি কবে গাহিয়াছি গান—
মাটির আঁধারে পেতেছি শুনিতে মাটি ফাটিবার স্বর।

মনের খেয়ালে একদিন আমি বাসিয়াছিলাম ভাল।
এই ধরণীর রূপ রং হাসি গান
মোর দেহহীন প্রেমের দিয়েছে রূপ—
রূপ সে তখনই ফেটে ফেটে গেছে ফেন-বুদ্বুদ সম।
দেহ জাগে আর দেহ কাঁদে হাহাকারে,
ভালবাসা কোথা পড়ে থাকে পিছে দেহ চলে আগে আগে ;
এমনই কত যে ঘটিয়াছে বার বার—
প্রেম-শিখা কত নিভিতে নিভিতে মাংসের ফুৎকারে
জয়ী হয়ে শেষে রয়ে গেল অচপল ;
রূপ হতে রূপে দেহ হতে তার গতি যে দেহান্তরে
খর উজ্জ্বল কখনো স্নিগ্ধ ম্লান,

জ্বলেছে কত যে বিভিন্ন স্নেহে আলো তার তবু এক।
চলচঞ্চল এ জগৎ মাঝে একা আমি পূরা নই,
বৃহৎ বিরাট কঠিন তবুও নিতান্ত অসহায়!
অক্টোপাসের বাহু—বাহু নয়, অসহায় কামনা যে—
যাহা আসে কাছে আঁকড়ি ধরিতে চাহে সে ব্যাকুল বলে!
মোর ভালবাসা শিশুকাল হতে ফিরেছে দোসর খুঁজে—
কখনো ভিক্ষা কভু কাতরতা কখনো পরাক্রম।
আজ সে বিবাগী, তবু
অজানা, অনাম, অনিশ্চিতের খুঁজিতেছে আশ্রয়।

মনের আবেগে একদিন আমি চলিয়াছিলাম পথ—
ভাবিয়াছিলাম পৌঁছিব পথশেষে।
পথের বিকারে পথ চলিয়াছি, পথ সে বিসর্পিত—
চক্রবালের সীমা শেষ তবু পথের চিহ্ন আঁকা,
চলার নাহিক শেষ।
অপরিচয়ের লভি পরিচয়, পরিচিতে যাই ভুলি—
পরম আদরে কভু ডাকিয়াছে দূরের পাহাড় বন,
উদার আকাশ নীলের অতলে প্রাণে জাগায়েছে আশা—
মেঘেতে মেদুর কখনো নয়নে দিয়েছে নীলাঞ্জন,
ভয় দেখায়েছে ভ্রূকুটি-কুটিল তড়িৎ-বহ্নি কভু,
ধূলিকঙ্কর কর্দ্দম কভু হয়েছে নয়নজলে,
ফুল হয়ে কত ফুটিয়াছে কাঁটা, কাঁটা হইয়াছে ফুল,
কত যে শ্মশান এ পথে হয়েছি পার,
কত জনপদ, ধূম্রমলিন চপল নগরী কত,

মৃত্যুর কোলে ঘুমন্ত কত গ্রাম,
চলেছি দেখেছি থামিয়াছি ভুলে বসেছি অন্যমনে,
তারকাখচিত আকাশের তলে বসিয়া শিহরি শুনি—
আলো-ইঙ্গিতে ডাক দিয়া মোরে বলিতেছে ছায়াপথ—
"ক্লান্ত পথিক, ওঠ, জাগো, আজো শ্রেয়কে হয় নি জানা।"
প্রেয় সে হারাল আজো সে শ্রেয়ের হইল না সন্ধান।

শ্রান্ত ক্লান্ত বসিয়াছি আজ শীর্ণ পথের ধারে
স্তিমিত তপন ধীরে ধীরে ডুবে যায়।
অরণ্যশিরে হেরি ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিছে ক্লান্ত পাখী
শুনিতেছি কানে তাহাদের কলগীতি।
বিহগের গানে রং-ধরা মেঘে জুড়ায় তপ্ত মন,
ক্লান্ত পাখায় বহি আনে তারা রাত্রির আশ্বাস—
যে রাত্রি বিশ্রাম।
দিবসের গ্লানি মুছিয়া লইতে মায়ের আঁচল সম
ধীরে ধীরে ধীরে নামিছে অন্ধকার ;
নামিছে সমুখে নামিছে পিছনে মম—
তোলা-ছবি আর আঁকা-ছবি মোর, সারা জীবনের কথা
কিশোর কালের হারানো গানের সুর,
অতি দুর্ম্মদ যৌবন-ভালবাসা,
হাজার শাখায় বিভক্ত মোর একটি চলার পথ,
বালককালের সেলেটের লেখা, ভুল সে আখরগুলি
মুছে দেবে কাল—তারই চলে আয়োজন ;
এ আঁধার তারই মুখনিঃসৃত বাষ্পের ফুৎকার !

সেই ফুৎকার লাগিছে আমার গায়ে
ঝাপসা হইয়া আসিতেছে চারিদিক—
জননী কোথায় গাহিছেন বসি ঘুমপাড়ানিয়া গান,
জড়াইয়া ধীরে আসিছে আঁখির পাতা
সারা জীবনের স্বপ্ন আমার, সারা জীবনের কাজ
লেপিয়া মুছিয়া হইতেছে একাকার।
তন্দ্রার মাঝে এইটুকু শুধু রহিয়াছে আশ্বাস,
অতি অস্ফুট শিশুর সে অনুভূতি—
শিয়রে জননী আছেন বসিয়া, তাঁরই কোলে মোর মাথা।

তাজ্জিক্ লোকসঙ্গীত

[আবদুল কাদির অনূদিত]

তাজ্জিক্ আমরা যা দেখি, তাকেই বেঁধে দিই গানে,
মনোহর অশ্ব যদি দেখি, তাই নিয়ে করি গীত-সৃষ্টি ।......
মধুকণ্ঠ কবিদের বিরচিত আমাদের লক্ষ লক্ষ গান
চলেছে কালের প্রান্ত বেয়ে ।
অন্তত ত্রি-যুগ ধরে,
ফুল আর ফুলেলা নারীর স্তবে
মুখর হয়েছে আমাদের কাব্যলোক ।
কিন্তু আজ ফুল আর নারী নয় :
সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত হচ্চে আমাদের নব-মুক্তি আজ,
বায়ু-যান নিয়ে ছন্দ বিরচনা,
সুর-মূর্চ্ছনায় রূপায়িত সুন্দর-ভবিষ্যতের দিনগুলি,—
কিন্তু সর্ব্বাধিক হচ্চে লেনিন্-সম্বন্ধে কাব্যচর্চ্চা ।
কেননা, কবিরা জানে, সে না হ'লে
সম্ভব হ'তো না নব-সঙ্গীতের জন্ম
(কুক্কুরের চীৎকারের তুল্য সে-সব গীতিকা ছাড়া
অর্থাৎ, আমীরদের স্তুতি,

তাহাদের সর্দ্দার-সেনানী সৈন্যাধ্যক্ষদের স্তুতি,
এই ছাড়া, আর-কিছু হ'তো না সম্ভব)।
লেনিন্ দিয়েছে আমাদের কবিদের
যাকে-খুশী নিয়ে গান ক'র্‌বার পূর্ণ-অধিকার ;
সে-আনন্দে তারা অবিলম্বে
লেনিন্‌কে নিয়ে আরম্ভ কর্‌লো কাব্য-গান ॥

একটি বেকার প্রেমিক

সমর সেন

চোরাবাজারে দিনের পর দিন ঘুরি

সকালে কলতলায়

ক্লান্ত গণিকারা কোলাহল করে,

খিদিরপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শুনি ;

মাঝে মাঝে ক্লান্ত ভাবে কি যেন ভাবি—

হে প্রেমের দেবতা, ঘুম যে আসে না, সিগারেট টানি

আর সহরের রাস্তায় কখনো বা প্রাণপণে দেখি

ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।

আর মদির মধ্য রাত্রে মাঝে মাঝে বলি—

মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও,

পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো,

হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন।

কলকাতার ক্লান্ত কোলাহলে

সকালে ঘুম ভাঙে

আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে

বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

বজ্রলিপি

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

মৃত্তিকার নীড় ত্যজি সমুদ্র ও আকাশের দুরন্ত মায়ায়
সুদূরের আকর্ষণে সুরু হ'ল প্রতীচির যন্ত্রঅভিযান
অবাধ বাণিজ্যছলে বিশ্বব্যাপ্ত কল্যাণী লক্ষ্মীরে
আসুরিক মন্ত্রবলে দ্বীপগৃহে বন্ধন আশায় ;
সেই যুগে,
মহাদেশদেশান্তের পণ্যবীথিকার
সুবিস্তৃত দীর্ঘ ছায়াতলে,
লুণ্ঠিত কাঞ্চনস্তূপ অন্তরাল অন্ধকারে
সন্তর্পণে রূপ নিল সর্ব্ব অগোচরে,
মানবের মস্তিষ্কের তন্তুজালমাঝে অর্থক্রিয়া বুদ্ধির বিজ্ঞান
সেই হ'তে সরস্বতী অলক্ষ্মীর দাসীবৃত্তি করে চিরদিন ।

সে যন্ত্রযুগের বংশধর উত্তরাধিকারী
বুদ্ধিজীবি মোরা ভাঙ্গিয়াছি
স্পন্দহীন অস্বীকার অয়স্কান্ত প্রত্যয়ের তলে
প্রাণবেগচাঞ্চল্যের চূড়ান্ত বিন্দুতে
স্থিরতার অন্তঃশিহরণে
মূকপ্রায় দৃশ্যমান বিশ্বপ্রকৃতিরে

ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর অন্ধ অণুস্তূপে ;
তারপরে বন্দী করিয়াছি
দেশকাল-অবচ্ছিন্ন বস্তুকারাগারে
লক্ষকোটী জড় স্থাস্নু পরমাণুদলে
অতীন্দ্রিয় কল্পনার অভৌতিক প্রেতযোনি গণিতের নিয়ম শৃঙ্খলে।

গর্ব্বভরে ভাবিয়াছি বিজ্ঞানের উর্দ্ধ জয়ধ্বজা
এ বিপুল পৃথ্বীতলে
নিরবধি কালে
এমনি রহিবে উচ্চ ;
অকস্মাৎ আমাদের সচকিত দৃষ্টিপথতলে
বিদ্যুতের শক্তিকণা
পরীক্ষা ও সমীক্ষার ঐকান্তিক কারণের বন্ধন টুটিয়া
মুক্তি লভে প্রাণবেগে
তরঙ্গিত সমষ্টিস্তবকে
অনেকান্ত আলোকের পুষ্পিত লতায়।

সেই দৃশ্যে পরভৃত মরমীর দলে
ওঠে মূঢ় জয়ধ্বনি স্বর্গপানে মহামুক্তিআশে ;
তাহাদের ভাবাবেগকল্পনার রঙ্গীন ফানুস
বস্তুময় ধরণীর মৃত্তিকারে ত্যজি
উড়ে চলে বিশ্ব-আত্মা পানে,
ক্ষীণবাত প্রতিবেশহীন মহাশূন্যে টলিতে টলিতে
অনির্ব্বাচ্য আরক্তিম মত্ততার বেগে।

স্বপ্নশিল্পী কল্পনাবিলাসী এই সব মধ্যপন্থীদল
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা মহাসত্যবাণী,—
ভুলিয়াছে সুযোগ বুঝিয়া ;
'মুক্তিমন্ত্রে শক্তিপূজা' বাক্যজালতলে
ঢাকিয়াছে সুগোপনে নিজেদের বীর্য্যের হীনতা ;
বাচনিক শুদ্ধ আন্দোলনে
গতিশীল জীবনেরে মিলাইতে চায় দর্পভরে
অবাস্তব অমৃতের অপরোক্ষ অনুভূতি সনে ;
কিন্তু থাকে সভয় দৃষ্টিতে সর্ব্বক্ষণ নয়ন মেলিয়া
মুষ্টিভিক্ষাবৃত্তিদাতা ধনগর্ব্বে স্ফীত বণিকে ;
রক্তচক্ষু পানে।

জাগ্রত চেতনান্তরে অনুক্ষণ কর্ম্ম ও চিন্তায়
সর্ব্বংসহা বসুমতী সম
যে বাস্তব বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে রহিয়াছে অচল অটল,
তারে এরা দিতে চায় উড়াইয়া
আত্মতত্ত্ব, মায়াবাদ,
বিশ্বপ্রেম, মানবতা, পরামুক্তি, ধূপের ধোঁয়ায়।
উদ্দেশ্য কেবল,
বৈশ্যদ্বারে উঞ্ছবৃত্তি করি
শূদ্রশক্তি জাগরণে ভয়ত্রস্ত বণিকের তরে,
ধর্ম্মের বচন রচি নির্ম্মম কালের যাত্রা যদি কিছু রুধিবারে পারে।

বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, মানুষের সব প্রতিষ্ঠান
বস্তুময় প্রকৃতিরে

দৈনন্দিন জীবনের চক্রনেমিপথে
সর্ব্বজন ব্যবহার সৌকর্য্যের তরে
অনাগত ভবিষ্যের ছায়াগ্রহ দর্পণের মত—
প্রয়োজন নিরপেক্ষ ইহাদের নাই কোন অহেতুক পরম শ্রেষ্ঠতা।

নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধির উর্দ্ধপথে
অতিবুদ্ধিবিভ্রাটের অতীন্দ্রিয় প্রগতির ফলে
বস্তুহীন শূন্যলোকে যদি কেহ লভে পরাস্থিতি
তার তরে নহে দেহ, অন্ন, প্রাণ, সমাজজীবন,
সমষ্টির অনেকান্ত বিরোধের অরণিঘর্ষণে
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ স্পর্শে নবযুগ খাণ্ডব দাহন।
ইহলোক-দেবতার কাঞ্চণের নিক্কনের সাথে
ক্লৈব্যগ্রস্ত তামসিক ঈশ্বরেরে ল'য়ে
দগ্ধপ্রাণ ভস্মরূপে ধরিত্রীর ভারের লাঘব,
পূর্ণতর জীবনের উর্দ্ধরতা সম্পাদন তরে,—
সুকঠিন বজ্রলিপি লেখা আছে তার লাগি
নিষ্করুণ অগ্নির অক্ষরে।

জীবন-দক্ষিণা

অরুণকুমার মিত্র

তোমরা সকলে মিলে আমারে বোঝাও ভুল অনেক রকম,
অজস্র মধুর কথা আহরিয়া গড়ো
মধুচক্র কামনার, তোমাদের সকলেরি কৃতিত্ব চরম—
মিথ্যারে এমন করে' মনোহর করো।
হাসিতে সোহাগে লাগে নেশা,
মন্থর-সঞ্চারী বিষ মেশা
সম্মোহন-মন্ত্র রচে তোমাদের সপ্তস্বরা বীণা—
আমি কি জানি না?

গণ্ডীঘেরা অন্তরালে নিশ্চিন্ত বিলাস—তারে প্রেম দিলে নাম,
তোমাদের ভালোবাসা পরশ-কাতর;
প্রত্যহের প্রবঞ্চনা—তোমরা বলিছ তারে জীবন-সংগ্রাম,
রক্তে রাঙা স্বর্ণস্তূপ—দেবতার বর;
শঠতা রয়েছে শুভাশীষে
প্রাণেরে মারে যে পিষে পিষে।
পৃথিবীরে পর করে তোমাদের ঘরের আঙ্গিনা—
আমি কি জানি না?

খনির গহ্বরপথে গভীর পাতালতলে যারা গেল নেমে
তাহাদের অনায়াসে ভুলে যেতে বলো ;
তোমরা ভুলাতে চাও, ঐশ্বর্য্যের পিছনে যে রহিয়াছে থেমে
যুগান্তের ইতিহাস অশ্রু-ছলছল ;
উৎসব-উল্লাসে নিশি-শেষে
শোকের মূর্চ্ছনা আসি মেশে।
তোমাদের লোভ চায় তিলে তিলে জীবন-দক্ষিণা—
আমি কি জানি না ?

পথ

গোলাম গফুর

[নীরেন্দ্রনাথ রায় অনূদিত]

* গোলাম গফুর সোভিয়েট উজবেকিস্থানের কবি। বহুযুগের অত্যাচারের পর এখন সেখানে গণশক্তি সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছে। *

প্রাচীন সুদীর্ঘ পথ ;
এই পথ বেয়ে
গেছে ধেয়ে দিকে দিকে দেশে দেশে
বিশ্বজয়ী সেকেন্দার,
শক্তিমত্ত রোমক কৈসার,
অকালে নিয়তি-হত বীর চেঙ্গিস।
এই পথে তৈমুরের প্রলয লাঞ্ছন,
মোঙ্গলের প্রতিহিংসাব্রত,
চৈনিকের বিজয়াভিযান।
মানুষ মেরেছে তারা,
লুটেছে উদ্যান।
রক্ত রক্ত রক্ত চারিধারে
জীবিতের বিভীষিকা যেথা 'জুজি' * গেছে।

* জুজি চেঙ্গিস খাঁর পুত্র ; রাজ্যবিস্তার করে ভল্‌গার কূলে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

এই পথ দিয়ে,
এই সব পৌরাণিক পথ চেয়ে চেয়ে
পার হয়ে উপত্যকা অধিত্যকা
গগন-বিস্তৃত ভূমি
চলেছে দাসের দল
অসহায় বিধবার দল,
গলায় শিকল বাঁধা
দশে দশে শতে শতে কোটিতে কোটিতে,
শাসিত নির্জ্জিত আর শাস্তি-প্রপীড়িত।
মাতিল ধ্বংসের লীলা চীন থেকে রোম
মস্কো বোম্বে যুক্ত হোলো ধ্বংসের প্রবাহে
ধাইল বিজয়োন্মত্ত সেনানী বাহিনী
কঙ্কাল করোটি দিলো ছেয়ে এই পথ।

এই সব সুপ্রাচীন পথ,
সাক্ষী যারা অতীতের হত্যাবিলাসের,
ইরাণ ভারত চীন তুর্কিস্তান হতে
পৃথিবীর সর্ব্বদেশ সর্ব্বকোণ হতে
এই সব পথ বেয়ে
ভবিষ্যতে করে যাতায়াত
সংখ্যাতীত শ্রমিকের দল
লৌহযন্ত্র-অধিরূঢ়
সমবেত সংঘবদ্ধ হয়ে
দপ্ত দ্রুত পদক্ষেপে।

এই সব সুপ্রাচীন পথ
আমাদের অমৃত-সঙ্কেত ;
আর এই সব পথ বেয়ে
প্রবাহিত হবে ভবিষ্যতে
মুক্তির স্বচ্ছন্দ-বাত্যা ;
নহে আর শোণিত-আঘ্রাণ ।

রক্তগোলাপ

কারাবিয়েভ

[অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত]

* কারাবিয়েভ নবজাগ্রত সোভিয়েট তুর্কমেনিস্থানের কবি। *

আজ আমি গান গাইব সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুমের।
প্রাচীন জগৎ আজ মৃত। আমার হাতের রক্ত-গোলাপগুলি
যেন আমাদের নতুন, জ্বলন্ত যুগের সদ্যোজাত শিশুর দল।

আমাদের উষ্ণ শোণিত আর খাঁ-দের কৃষ্ণাভ গাঢ় রক্ত দিয়ে
রঞ্জিত হয়েছিল একদিন এই সব সীমাহীন মরুর প্রতি বালুকণা।
অতীতের কুয়াশাচ্ছন্ন ক্ষয়িষ্ণু দিনগুলি থেকে
জীবন লাভ করেছে এই রক্ত-গোলাপগুলি।
নতুন এক সূর্য্য আজ আকাশে ভাস্বর হ'যে উঠেছে—
নব মুক্তির সূর্য্য,
এই সূর্য্যের মতো মনোহর পৃথিবীতে আর কিছুই নেই।

তুর্কমেনিয়া, আমার দেশ, আমার সোভিয়েট পিতৃভূমি,
আনন্দের ফুলের মতো জীবন আজ তোমার কাছে
মুঞ্জরিত হ'য়ে উঠেছে,
এই জীবন গ্রহণ করো,
এই ফুলের আঘ্রাণ নাও,
সাম্যের সৌরভে প্রতিদিনকে পূর্ণ ক'রে তোল।

বারো

আলেক্জান্দার ব্লক

[সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত]

* এই কবিতাটি লেখা হোয়েছিলো ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে, বিপ্লবের দু'মাস পরে। বিপ্লবের প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে সমস্ত জীবন তখন সবেমাত্র ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। পুরণো জীবনের সেই টুক্‌রোগুলো চারিদিকে ছড়ানো। এই কবিতা হচ্ছে সেই পুরণো জীবনের ভাঙ্গা টুক্‌রোগুলির ছবি। ব্লক হচ্ছেন লিরিক কবি, সিম্‌বলিজমের উপাসক। তিনি ছবি আঁকেন না, তিনি অনুভূতি আঁকেন। জীবনের ক্ষণ-আয়ু মুহূর্ত্তগুলি, যেগুলি অনুভূতির রসে নিটোল, যেগুলি অনেকটা সময় জুড়ে থাকে না বলে সকলের চোখে পড়ে না, সেই মুহূর্ত্তগুলির কবি হচ্ছেন ব্লক। তিনি হচ্ছেন ক্ষণিকের গভীরতার কবি। একটি মহা-বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যেতে হোয়েছিলো সেই কবিকে। সেই ঝড় যখন চারিদিকে ঘিরে এলো তখন লিরিক-কবি লিরিকের চোখে সেই ঝড়কে দেখলেন না। তিনি ড্রামাটিকের চোখ নিয়ে সেই বিপ্লবকে দেখলেন। তিনি বল্লেন এ'বার আমি কথা দিয়ে, ছন্দে বেঁধে এই ঝড়ের ছবি আঁকবো। সেই ছবির মধ্যে দিয়ে অনুভূতির ছোঁওয়া পাওয়া যাবে কিন্তু এটা অনুভূতির ছবি হ'বে না।

সুরু হোলো ছবি অন্ধকার রাতে। ঝড়, বরফের ঝড়। পথে চলা দায়। সেই অন্ধকার পথে আমরা দেখি বুড়ীকে। বুড়ী কেঁদে মরে। যা' কিছু সে দেখে সবই তার কাছে অবোধ্য। বুর্জ্জোয়া চলে কামিজ দিয়ে নাক ঢেকে। পুরোত চলে পথের কোণ ঘেসে, মুখ কাঁচুমাচু কোরে। ধনীর ঘরণী দামী কালো ফারে দেহ আবৃত করে চলে, নিরাশায় চোখের জল ফেলে, ঝড়ে পড়ে যায়। গণিকার কথা, হাওয়ায় ভেসে আসে। গণিকা স্মরণ করে তার অতীত জীবনের কথা। বুড়ী, বুর্জ্জোয়া, পুরোত, ধনীর ঘরণী, গণিকা এরা সকলেই সেই পুরণো জীবনের ভাঙ্গা টুকরোগুলি। সেই পথে এলো বারোজন সৈনিক। তারা বিপ্লবের সৈনিক।

তারা সব কিছু করবার জন্যে তৈয়ার। কাটিয়া সে গণিকা, সেও সেই পথে দেখা দিলো। ছবির রুদ্র রঙ্গে কোমলের আমেজ লাগলো। খুন, লুট, সব সেই পথে হোয়ে গেলো কিন্তু তারা সেই বারো জন এগিয়ে চললো। ক্রুশে তাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই। রক্ত পতাকা হাতে তারা চললো। তারা সব কিছুর জন্যে প্রস্তুত।

ব্লক এই কবিতায় নানা ছন্দ ব্যবহার কোরে পথের বিচিত্র রূপকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। বুড়ী এক ছন্দে কথা বলে, বুর্জ্জোয়া আর এক ছন্দে কথা বলে, কবি অন্য ছন্দে কথা কয়, ধনীর গৃহিণীও পৃথক ছন্দে কথা কয়। সেই সব ছন্দ নিয়ে পথের সৃষ্টি হোয়েছে। ব্লক তাই এই কবিতায় অতি পুরাতন গ্রাম্য ছন্দ থেকে আরম্ভ করে নানা ধরণের আধুনিক ছন্দ ব্যবহার করেছেন। লিরিককে ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেও ব্লক সম্পূর্ণ রূপে লিরিককে ঠেকিয়ে রাখতে সমর্থ হন নি। কবিতায় স্থানে স্থানে লিরিক্ আচম্‌কা হাজির হোয়েছে।

বইয়ের নাম ব্লক "বারো" দিয়েছেন কেন তাই নিয়ে অনেক মতদ্বৈধ আছে। কবি যে বিপ্লবী সৈনিকদের সংখ্যা বারো নির্ব্বাচন করেছেন তার কি কোনো বিশেষ অর্থ আছে, না সেটা অহেতুক? কারো কারো মতে ব্লক কবিতাটিকে খৃষ্টের লাল নিশান নিয়ে পথ চলার যে সিম্‌বলিক্ ছবি দিয়ে শেষ করেছেন, সেই সমাপ্তি থেকেই পরিস্ফুট হচ্ছে কেন কবিতার নামকরণ হয়েছে "বারো"। খৃষ্টের প্রধান শিষ্যদের সংখ্যা ছিলো বারো। সেই বারো জন এক নতুন বার্ত্তা প্রচার কোরেছিলো সেই সে অতীতে। এই বারো জনও এক নতুন বার্ত্তা বহন কোরে এনেছে। এরা খৃষ্টকে চায় না, এরা ক্রুশকে পদে পদে অস্বীকার করছে, তবুও কবির মতে প্রত্যেক নব জীবনের বার্ত্তা বহন করে আনে যারা, তারা খ্রীষ্টকে সামনে নিয়ে আসে। যারা খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে তারাও তাঁকে সামনে নিয়ে পথ চলে।

১৯১৮ সালে বল্‌শেভিক্ দল এই কবিতাটীকে লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় মুদ্রিত করে সারা রাশিয়ায় গণসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই কবিতাটী পৃথিবীর বহু ভাষায় অনুদিত হয়েছে। রুশীয় ভাষা থেকে অনুবাদ করবার সময় মূল কবিতায় যে বিভিন্ন ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেই ছন্দগুলি বজায় রাখবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।—অনুবাদক। *

[নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ—

ভাঙ্কা—সৈনিক ; কাটিয়া—গণিকা ;

আন্‌দ্রুখা—সৈনিক ; পেট্‌রুখা—সৈনিক ;

বুড়ী, কবি, ধনীর গৃহিণী, গণিকা, পুরোহিত

ও বারোজন সৈনিক ।]

আঁধার সন্ধ্যাকাশ ।

তুষার চতুর্দ্দিক,

বাতাস, বাতাস ।

পায়ে করে ভর দাঁড়াতে পারে না পথিক ।

বাতাস, বাতাস,

সারা দুনিয়ায় বায়ু ছোটে নির্ভীক ।

বায়ু ঘুর্ণি খাওয়ায়, উড়িয়ে নে যায়

দানা শাদা তুষারের ।

তুষারের তলে—প্রান্তর বরফের ।

অতি পিচ্ছিল, পথ চলা বড় দায়,

পিছ্‌লায় পা পথ-চলা পথিকের,

আঃ—অভাগা পান্থ হায় ।

বাড়ী হতে বাড়ী

টাঙ্গানো হয়েছে তার ।

তারেতে—ইস্তাহার ;

"শুধু প্রতিনিধিসভা শাসনের অধিকারী ।"

বুড়ী দুঃখেতে মরে, ক্রন্দন করে,
কিছুতে বোঝেনা এ'সব কিসের তরে,
কেন বা ইস্তাহার,
এতটা কাপড়ে কি যে হ'বে বোঝা দায়।
এতটা কাপড়ে কত যে পট্টি হোত সবার।
বস্ত্র-পাদুকা-হীন প্রতিজনা হায়!

কুক্কুটি সম বৃদ্ধা সে একাকিনী
বরফের স্তূপ লাফায়ে ডিঙ্গিয়ে চলে।
ওমা ভগবতী নিখিল-তারিনী,
বল্‌শেভিকেরা পাঠায় কবরতলে।

কশাঘাত হানে হাওয়া।
কুয়াশা নাহিকো থাকে,
চৌমাথে বুর্জ্জোয়া
কামিজেতে নাক ঢাকে।

এ আবার কে? দীর্ঘ চিকণ কেশ,
বলিতেছে মৃদুস্বরে,
"বিশ্বাস-ঘাতকেরা
রাশিয়ারে খুন করে।"
লেখক হবার কথা—
আঃ কবি, বোঝা গেল বেশ।

দেহখানি ঢাকা আলখাল্লার তলে,
ধারে ঘেঁসে চলে বরফের স্তূপ হেরে,
অতি মনমরা কে সে যায় পথ চলে ?
বুঝি পুরোহিত ভায়া ফেরে !

মনে পড়ে কিগো সেই অতীতের কালে
কে ভুঁড়ি আগিয়ে চলেছিল পথ ধরে ?
ক্রুশখানি দোলে ভুঁড়ি-পরে তালে তালে,
ক্রুশখানি যা'তে সকলের চোখে পড়ে।

কালো কারাকুলে* ঐ সে রমণী যায়।
আসে সে রমণী কারে যেন সাথে করে,—
কেঁদেছি আমরা, কেঁদেছি গো নিরাশায়
পিছ্‌লিয়ে মোরা পড়ে গেছি ভূমি পরে।
হায় ভগবান, এলায়ে পড়েছি রে।

স্ফূর্ত্তি-মাতাল হাওয়া
মধুর ও কুটিল হাওয়া
নাড়ে ঘাঘ্‌রার কোণা হেসে।
বায়ু বেঁধে পথিকের এসে,
গর্জ্জায় রোষে ছিঁড়ে নেয় শেষে

বৃহৎ ইস্তাহার—

"শুধু প্রতিনিধি সভা অধিকারী ক্ষমতার"
বায়ু কথা নিয়ে আসে ভেসে।

---

* খুব দামী কালো ফার।

······এ' বাড়ীতে সভা যবে
করেছিনু মোরা সবে
করেছিনু স্থির তবে,
আলোচনা করে সবে
ঘণ্টায়—দশ, পঁচিশ—রাত্রি হ'লে,
নেবো না কো কম ভুলিয়া কথার ছলে,
চলো ঘুমতে শয্যাতলে।

গভীর হোয়েছে রাতি
জনহীন খালি গলি,
যায় এক গৃহহারা
নুয়ে নুয়ে পথ চলি'।
বায়ু শিষ দেয় মাতি'।
হায় রে বেচারা!
কাছে আয় চলে,
চুমু দেবো তোরে
চাস্ রুটি, ওরে?
ভবিষ্যতে কি আছে কপালে কে ব'লে?
যাও চলে।

কালো, কালোয় আকাশ মোড়া।
হিংসা, হিংসা বেদনাভরা
ফুটিয়া উঠেছে বুকে,
কুটিল হিংসা, হিংসা পুণ্যভরা।

সখা, দেখ চেয়ে সম্মুখে
আঁখি মেলি' দেখো ত্বরা।

(২)

বাতাস ঘোরে ফেরে, বরফ উড়ে পড়ে,
বারোজন লোক চলে যায় পথ ধরে।

কালো চর্ম্মেতে বাঁধা বন্দুক কাঁধে দোলে
চারিদিকে শুধু আগুন, আগুন জ্বলে।

মুখেতে চুরুট, মাথা কার্ত্তুজে* ঢাকা
পিঠে কয়েদীর চিহ্ন রয়েছে আঁকা।

মুক্তি বাঁধনহারা
আঃ আঃ ক্রুশ ছাড়া
ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা রে খাপছাড়া।

বসে ভাঙ্কার সাথে কাটিয়া কাবাকে† এসে,
তার মোজার ভিতরে টাকা রাখিয়াছে ঠেসে,

এবে ভাঙ্কা নিজেই ধনীলোক একজন,
ছিল ভাঙ্কা মোদের, এখন সে পল্টন।

বলি ও ভাঙ্কা, জানোয়ার পশু, নরাধম বুর্জ্জুই,
মোর কাটিয়ায় চুমো খেতে করে দেখ্‌না চেষ্টা তুই!

---

* কার্ত্তুজ—একরকম টুপি

† যেখানে মদ প্রভৃতি বিক্রয় হয় সেই রকম আড্ডার জায়গার নাম হচ্ছে কাবাক।

মুক্তি, মুক্তি বাঁধনহারা
আঃ আঃ ক্রুশ ছাড়া।
ডাক্তার সাথে কাটিয়া ব্যস্ত কত,
বলি কিসে, কিসে সে ব্যস্ত এত ?

চারিদিকে শুধু আগুন, আগুন, আগুন......
স্কন্ধেতে বাঁধা বন্দুক অকরুণ।

পা সামাল্, ওরে বিপ্লবী হুশিয়ার !
না দেখে স্বপন দুশমন অনিবার।

তোল বন্দুক, ভীরু হোয়ো নাকো ভায়া,
পুণ্য রুশেরে গুলি কর, কেন মায়া ?

দুর্জ্জয় রাশিয়ায়,
কুঁড়ে-ঢাকা রাশিয়ায়,
স্থূলকায়া রাশিয়ায় !
হুসিয়ার দোস্ত্, মাড়ায়োনা ক্রুশ-ছায়া।

(৩)

দোস্ত্রা মোদের এল কেমন তর ?
কাজ করে তারা লালপল্টনে সবে।
লালপল্টনে কাজ করে তারা সবে,
মৃত্যুকে তারা ডেকে নেয় শিরপর।

ও তুই তিতো-দুঃখ রে—
জীবনটা কি মিঠে !
হোক্‌না ছেঁড়া কাপড় রে—
আছে বন্দুক তো পিঠে !

মোরা বুর্জ্জোয়াদের মনে দুঃখ দিয়ে
দোবো নিখিলময় আগুন ছড়াইয়ে,
রক্ত দিয়ে আগুন দোবো জ্বালি,'
প্রভু, দাওগো শিরে আশীষ-বারি ঢালি' ।

(৪)

তুষার ছিটয়, গাড়োয়ান জোরে ডাকে ।
কাটিয়াকে লয়ে ভাঙ্গা গাড়ীতে হাঁকে ।
বিদ্যুৎ-আলো জ্বলে
ঘোড়ার সাজের গলে
আঃ ভেঙ্গে পড় ভূমিতলে ।

সে সৈনিকেরি লম্বা কোটেতে ।
বোকা যে সে স্পষ্ট লেখা মুখের ছাঁদেতে ।
পাকায় কেবল পাকায় কালো গোঁফ ।
সে গোঁফের ডগা পাকায় সজোরে,
সে ব্রুস্ত রগড়ে ।

এই আমাদের ভাঙ্গা—সে জোরদার।
এই আমাদের ভাস্কা—সে বোল্‌দার।
কাটিয়ারে জড়িয়ে ধরে দুই হাতে
চায় কথার খেলায় মনটি ভোলাতে।

কাটিয়া তার মুখখানিরে তোলে,
দাঁতগুলি তার মুক্তাসম জ্বলে।
হায়, তুই কাটিয়া, মোর কাটিয়া,
তোর গোলগাল মুখ, প্রিয়া।

(৫)

কাটিয়া তোর পেলব গ্রীবা পরে
ছুরির ক্ষত শুকয়নি তো আজো,
কাটিয়া তোর পয়োধরের পরে
নখের আঁচড় মিলয়নি তো আজো!

আঃ স্থরু কর তুই নাচ এইবারে,
শাণিত ছুরিকা ব্যথা দেয় বড়, নারে?

গেলিরে তুই লেশ দেওয়া সাজ পরে
বেড়ারে তুই কসে,
সৈনিকেরি সাথে দূরে ঘুরলি স্থখভরে
ঘোর ছুনিয়া চষে।

আঃ বেড়া ভবন তলে
শুকিয়ে গেল মন বুকেরি তলে।

সেই সৈনিকে মনে পড়ে ফিরে তোর ?
সে সময় পাইনি ছুরি থেকে দূরে যেতে,
মনে পড়ে ফিরে তোর প্রলাপের ঘোর ?
অথবা স্মরণ নাই তাজা বক্ষেতে ?

দেরে বিশ্রাম-সুখ ওরে।
ওর সাথে তুই শোগে শয্যার পরে।

ঘুরতি তখন কাপ্তেনেরি সাথ,
এখন বেড়াস্ ধরে সৈনিকেরি হাত।

অবাধে তুই কর্‌না কিছু পাপ
হাল্‌কা হ'বে মনের বোঝার চাপ।

(৬)

কদম চালে দ্রুত তালে ঘোড়ায় ছুটিয়ে
চীৎকারে দেয় গাড়োয়ান আকাশ কাটিয়ে।

থাম্, থাম্, আন্‌দ্রুখা, সাহায্য কর্
পেট্রুখা, পিছু পিছু ছোট্ তড়্ বড়্।

ত্রাক, তারা রাখ, তাখ, তাখ, তাখ, তাখ,
আকাশেতে ছিটকিয় বরফের ঝাঁক।

ডাক্তার সাথে পলাতক গাড়োয়ান,
ওরে, বন্দুক তোল্, কর তারে সন্ধান।

আজ্ তারা রাখ্ সমঝাবি এইবার,
অচেনা মেয়ের সাথে সুখ বেড়াবার।

পলাতক বদমাস, একটু সবুর কর্,
কাল্ হ'বে বোঝা পড়া তোর সাথে জবর।

কোথায় কাটিয়া ? মৃতা, হায় সে গো মৃতা,
গুলিতে বিদ্ধ মাথা ধূলি-লুণ্ঠিতা।

বলি, খুসী কি কাটিয়া ? চুপ কর্, চুপ কর্,
পড়ে থাক্ তুই দেহ বরফের পর।

বিপ্লবী হুশিয়ার,
ক্লান্তিবিহীন দুশমন্ তৈয়ার।

(৭)

চলে পথে ফের সৈনিক বারোজন
কাঁধে বাঁধা বন্দুক,
মনে হয় যেন আঁধারের আবরণ
হত্যাকারীর মুখ।

ক্ষিপ্র হতে ক্ষিপ্রতর আরো
পা ফেলে সে যায়,
গলায় রুমাল জড়ায় কেমন তর
তার নজর নাহি তা'য়।

কি দোস্ত্, বলি স্ফূর্ত্তি নেই যে বড়,
কেন্‌রে বোকা ঝিমিয়ে গেলি কেন ?
কি পেট্রুখা, তোর মুখ কেন এই তর ?
বুঝি ক্যাটার দুখে মন্‌টা মরা হেন !

শোন্‌রে বলি প্রাণের দোস্ত্‌রা মোর,
এই মেয়েরে বেসেছিনু ভালো।
সুরার নেশায় রাত্রি কালো ঘোর,
এর সাথেতে কাটিয়েছিনু ভালো।

তার আগুনভরা হৃদয়-কাড়া
নয়ন দুটির তরে,
তার ডা'ন কাঁধেরে রক্তপারা
তিলের টানে পড়ে
না ভাবিয়া খুন করেছি ওরে,
খুন করেছি বদ রাগেরি ঘোরে।

কি দোস্ত্, ভাঁজিস্ এক ঘেঁয়ে সুর কেন ?
কি পেট্রুখা, তুই জটাই বুড়ী নাকি ?
মনটাকে তুই উল্টোতে চাস্ যেন,

করনা বদল, তাইতে ক্ষতি বা কি ?
হারাস্ না কো দখল নিজের পর।
মনকে বসে রাখিস্ নিরন্তর।

তেমন সময় নেই কো এখন আর
যে তোর পিছনে সময় দিতে পারি,
ক্রমেই ভারী হ'বে মোদের ভার,
মনে রাখিস্ দোস্ত্‌রে, হুশিয়ারী।
কথা, পেটুখার মনের পরে দেগে,
কমায় তাহার দ্রুত চলার বেগে।

সে মাথা তোলো উপর পানে ঠেলে,
ফুর্ত্তিতে পা ফেলে।

তবুও তোরে হায়,
দুখ ভোলা না যায়।

বন্ধ কর দ্বার,
হ'বে লুট সুরু এইবার।

দাও খুলে দাও ভাঁড়ার ঘরের তালা,
ঘুর্‌ছে গরীব, এ'বার তাদের পালা।

(৮)

ও তুই তিতো-দুঃখ রে
ক্লান্তি একঘেয়ে
—মরণ সমরে।

—কতটা তো সময় আমি
কাটিয়েছি গো কাটিয়েছি।

মাথার ঘন চুলের মাঝে
—কতই উকুন বেছেছি।

পদ্মবীচির খোলস ভেঙ্গে
বীচি কতই ছাঁড়িয়েছি।

কতক্ষণ তো ছুরিটারে
শানিয়েছি গো শানিয়েছি।

পালা তুই বুর্জুই, চড়ুই পাখী,
পান করবো রক্ত তোর।
তরে কৃষ্ণকালো ভুরুর জোড়,
প্রিয়ার মোর।

শান্তি দাও গো, তোমার দাসে, হে ঈশ্বর,
আঃ, কি একঘেয়ে দিন মোর

(৯)

নাহি যায় শোনা কোলাহল নগরীর।
নীরবতা রাজে নেভার দুর্গ জুড়ে।
চিরতরে শেষ পথে পুলিশের ভিড়।
বেড়ারে ভাইরা, যেথা খুসী সেথা ঘুরে।

আছে চৌমাথে বুর্জোয়া দাঁড়াইয়া,
কামিজটি দিয়ে নাকটি তাহার ঢেকে,
ঘেয়ো কুকুর লাঙ্গুল গুটাইয়া,
গা ঘেঁসিয়া রয় প্রভুর পাশেতে বেঁকে।

বুর্জোয়া থাকে ক্ষুধিত কুকুর সম,
নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে প্রশ্নেরি প্রায়,
লাঙ্গুল গুটা'য়ে থাকে পাশে দীনতম,
আশ্রয়হীন কুকুর হেন প্রাচীন ধরা, হায়!

(১০)

ঝড় একি খেলা খেলে পথতলে?
ওঃ ঝড়, কি ভীষণ ঝড়!
পরস্পরেরে দৃষ্টি নাহিক চলে,
দেখা নাহি যায় এক হাত অন্তর।

চিমণী ঘিরে বরফ মালা গাঁথে।
ওঠে গম্বুজেরি মত বরফ রাতে।

ওঃ কি ভীষণ বরফের ঝড়, রক্ষা কর্
পেট্রুখা, থামা বাজে কথার বহর।
বাঁচাতে চাস্ কেনরে তুই বল্
সোনার মোড়া পূজার বেদীতল?
জানি যে তোর নাই চেতনা নাই

তবু একটুখানি দেখ্‌না ভেবে ভাই ।
হাত কিরে তোর রক্তে রাঙা নয় ?
তোর কাটিয়ার প্রেমের পরিচয় ?

ইন্‌কিলাবী* হও রে হুশিয়ার,
নিকটেতে ক্লান্তি-বিহীন দুষমন দুর্ব্বার ।

এগিয়ে চল্‌, এগিয়ে চল্‌, এগিয়ে চল্‌,
শ্রমিকদল ।

(১১)

চলে বেপরোয়া নির্ভীক,
বারোজন সৈনিক ।
সব তরে তৈয়ার,
বাধে না কো কিছু আর ।

ঝোলে স্কন্ধেতে বন্দুক
তরে শত্রুর বুক ।

নিঝুম ছোট গলি,
বরফ উড়াইয়ে ঝটিকা যেথা যায়,
পালক হেন বরফে যেই চলি,
পাদুকা দুটি যে গো টানিয়া তোলা দায় ।

চোখে বাজে, দোলে
লাল নিশান,

* ইন্‌কিলাব—বিপ্লব, ইন্‌কিলাবী—বিপ্লবী

তালেতে পা তোলে
সব জোয়ান।

অরি ওঠে জেগে
নিঠুর-প্রাণ····

বরফের ঝড় চোখে বেঁধে আসি'
দিবস নিশি
অহর্নিশি।

এগিয়ে চল্
শ্রমিকদল।

(১২)

দূরেতে যায় চরণ ফেলে জোরে,
হোথায় কে? আয় বেরিয়ে আয়
এতো বাতাস রক্ত নিশান ধরে,
খেলা করে পথের কিনারায়।

—সামনে রাজে উঁচু বরফরাশি,
কে সেথায়? বেরিয়ে আয়,
কাঁপে ক্ষুধায় কুকুর উপবাসী,
পিছু পিছু নেংচে চলে যায়।

পালা রে তুই কুকুর ঘায়ে-ভরা
নইলে লাঠি আস্‌বে পিঠে নামি,'
প্রাচীন ধরা যেয়ো কুকুরপারা
মান্‌রে হার, মার্‌বো তোরে আমি।

নেকড়ে ক্ষুধায় দাঁতগুলি বার করে
ক্লান্ত লাঙ্গুল না থাকে উপরে উঠে।
আশ্রয়হারা কুকুর শীতেতে মরে,
শুনি পদধ্বনি, আঁধারে কে যায় ছুটে?

লয়ে লাল নিশান, কে হোথা যায়?
দেখ্‌ চেয়ে দেখ্‌ ঘোর আঁধার।
ত্বরিৎ পদেতে কে হোথা ধায়?
বাড়ীতে লুকিয়ে সোনার ভার!

পরোয়া নেই পাক্‌ড়াবো ঠিক তোরে,
ভালো চাস্‌ যদি নিজ হ'তে দে রে ধরা,
বাড়াস্‌ নে তোর দুঃখ পথিক ওরে
গুলি সুরু হ'বে, বাহিরেতে আয় ত্বরা।

ত্রাখ্‌ ত্রাখ্‌ ত্রাখ্‌—শুধু সেথা প্রতিধ্বনি
বাড়ীতে আঘাতি' ঠিক্‌রিয়ে আসে চলে······
শুধু ঝটিকার একটানা হাসি-ধ্বনি
বরফের পরে লুটিয়ে পড়িছে গলে।

আখ্‌, আখ্‌, আখ্‌,
আখ্‌, আখ্‌, আখ্‌·

এই মত যায় সজোরে চরণ ফেলি'
ক্ষুধিত কুকুর পাছে,
সমুখে—রক্তেতে রাঙা পতাকা ঊর্দ্ধে মেলি'
ঝড়ের বক্ষে মৃদু চরণেতে চলি'
মুক্তার মত বরফের দানা দলি'।
শাদা গোলাপের মালিকা মাথায় পরে
যা'ন খৃষ্ট পতাকা ধরে ॥

মাদ্রিদ : ১৯৩৬

ফ্র্যাঙ্ক পিট্‌কের্ণ

[সঞ্জয় গুপ্ত অনূদিত]

* গ্রন্থকারের 'Reporter in Spain' থেকে এই সত্য ঘটনাটির অনুবাদ নীচে দেওয়া হল। পড়লে এটাকে গল্প বলেই মনে হবে। *

মিগুয়েল একজন কম্যুনিষ্ট; সে ছিল সাধারণ কারিগর আর কোন এক ট্রেড-ইউনিয়নের সম্পাদক। বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে স্বদেশরক্ষায় নিযুক্ত সে একজন স্বেচ্ছাসৈনিক। পার্ব্বত্য প্রদেশের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সম্প্রতি সে ফিরে এসেছে—একটু বিশ্রামের জন্য। কিন্তু তখনও সে ছিল ট্রেড ইউনিয়ন সেনা-বাহিনীর একজন পরামর্শ-দাতা; সকাল ও সন্ধ্যায় সে এই কাজই করত। সে ছিল সেই শ্রেণীর সৈনিক যাদের বিদেশীরা মনে করত সৌখীন চাকুরে; কেন না তারা প্রায়ই দেখতে পেত যে এই সব সৈনিকেরা হয় কাফেতে বসে আছে, না হয় যে সব সুন্দর রাজপথ তারা প্রাণপাত করে রক্ষা করেছে, সেখানে নিশ্চিন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তখন অগষ্ট মাস; ঘনায়মান সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারে বাড়ী থেকে সে সহরের মাঝামাঝি যায়গায় একটী কাফেতে যাচ্ছিল।

স্বদেশরক্ষী সৈনিকের পোযাকপরা একদল লোক গাড়ীতে করে তার দিকে আস্‌ছিল; কাছে এসে তার কাছে কি সব কাগজপত্র আছে তারা দেখতে চাইল; সে-ও তার কাছে যা' কাগজপত্র ছিল একে একে বার করে সব তাদের দেখাল :—কাগজপত্রের মধ্যে ছিল একখানা 'মিলিশিয়া কার্ড', একখানী 'ট্রেড-ইউনিয়ন কার্ড', এবং

একখানা কম্যুনিষ্ট দলের পরিচয়পত্র। গাড়ীর সৈনিকদের নেতা তার কাগজপত্রগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে বল্‌লে যে সে এতেও ঠিক নিশ্চিত হতে পার্‌ছে না। মিগুয়েল বরং তাদের সঙ্গে তাদের আড্ডায় চলুক। অবশ্য এতে একটু বিরক্তি বোধ করলেও সে ভাল ক'রে ভেবে দেখল যে তাদের সঙ্ঘভুক্ত সভ্যদের পক্ষে কর্ত্তব্যে শিথিল হওয়ার চাইতে একটু বেশী কড়াকড়ি করা এবং সামান্য বিষয় নিয়ে হৈ চৈ করাও বরং ভাল। তারপরে সে গাড়ীর পিছনে উঠে দাঁড়াল।

গাড়ীখানার হঠাৎ ছাড়বার ভঙ্গী, হয়তো বা দু'একটা কথা নিজের অজ্ঞাতে শুনে ফেলা—এই সবগুলোর ফলে তার মন যেন আসন্ন বিপদের একটা সঙ্কেত পেল! একটা ভয়ঙ্কর সন্দেহে তার সমস্ত শরীর হিম হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। গাড়ী ক্রমে যেমন বেগসঞ্চয় করতে লাগ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে তার সে সন্দেহ আর সন্দেহ রইল না। ব্যাপারটা যে কি দাঁড়াবে তা সে বেশ পরিষ্কার বুঝ্‌তে পার্‌ল। গাড়ীর মধ্যে সৈনিকেরা তখন খোলাখুলিভাবেই কথাবার্ত্তা সুরু করে দিয়েছে; এবং তাদের এই আলাপআলোচনা শুনে মিগুয়েলের মনে আর বিন্দুমাত্রও সংশয় রইল না যে সে পরিষ্কার একজন ছদ্মবেশী ফ্যাশিষ্ট গোলন্দাজের কবলে পড়েছে।

সে চুপচাপ বসে' ভাবতে লাগল; সে ভাবলে ঃ—"যাই ঘটুক না কেন, আমার নিশ্চিত মৃত্যুর আর বেশী দেরী নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও মরার আগে আমাদের গণতন্ত্রের জন্য একটা কিছু করে যেতে পারি।"

নিঃসাড় নিস্তব্ধ হ'য়ে সে বসে' রইল; তার মাংসপেশীগুলো দৃঢ়, কঠিন; দৃষ্টি তার সম্মুখের পথে নিবদ্ধ।

এমনি সময় একটা ব্যাপার ঘট্‌ল; সত্যিকারের একদল সৈনিক গাড়ীতে করে' ঐ পথে পাহারা দিচ্ছিল; তারা দেখল, ঠিক তাদের বিপরীত দিক থেকে একখানা মোটর খুব দ্রুতবেগে তাদের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে, এবং সে গাড়ীর মধ্যে লোকদের দেখতে রক্ষী সৈনিকদের মত। সেই গাড়ীর পিছন থেকে হঠাৎ কেউ একজন উঠে দাঁড়িয়ে ফ্যাশিষ্ট কায়দায় হাত তুলে তাদের অভিবাদন জানিয়ে চিৎকার করে বল্‌তে লাগল, "গণতন্ত্র ধ্বংস হোক" "ফ্যাশিজমের জয় হোক", "রিপাব্‌লিক নিপাত যাক্‌"।

লোকটীর এই চীৎকার আর হাতনাড়া থাম্‌তে না থাম্‌তেই সান্ত্রীদের গাড়ী থেকে বন্দুকের গুলি ছুট্‌ল, ফ্যাশিষ্টরা প্রত্যুত্তরে গুলি ছোড়ার সময় পাবার আগেই ঐ গাড়ী থেকে বুলেটের পর বুলেট এসে তাদের ছেয়ে ফেল্‌ল, গাড়ীর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তারাও চাপা পড়ল।

সান্ত্রীদের গাড়ীখানা থাম্‌ল; আর দু'জন বেরিয়ে এল তদন্ত করতে। চারজন মরে গিয়েছিল; তাদের পকেটে খোঁজ করে তারা এমন কতগুলো কাগজপত্র পেল যাতে বোঝা গেল যে সেই চারজনই ফ্যাশিষ্ট। এ চারজন ছাড়া আর একজনকে তারা দেখতে পেল, সে তখনও বেঁচে ছিল। তার পকেটে খোঁজ করে তারা পেল একখানা 'মিলিশিয়া কার্ড', একখানা 'ট্রেড ইউনিয়ন কার্ড', এবং একখানা কম্যুনিষ্ট দলের কার্ড—তার কোনটিই ভুয়ো নয়। এতে তারা সবাই খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল।

সকলে মিলে তারা ধরাধরি করে মিগুয়েলকে রাস্তার ধারে শুইয়ে রাখল। উপরে যে ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেইটী তাদের বল্‌বার পরই মিগুয়েলের মৃত্যু হল।

সই

বিভুতিভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুপুরে বাসায় শুইয়া আছি এমন সময়ে উচ্ছলিত খুসি ও প্রচুর তরল হাস্য মিশ্রিত তরুণ কণ্ঠস্বরে শুনিতে পাইলাম, ও সই সই লো—ও—ও, ক্যামন আছ, ও সই ?

পাশের ঘর হইতে আমার ভগ্নি (বিধবা, বয়স ত্রিশের বেশী) হাসির সুরেই বলিল, এস সই, এস। ব'স, কি ভাগ্যি যে এ পথে এলে ?

—এই তোমার সয়া হাট কত্তি এল। নতুন গুড়ের পাটালি সের দুই করেলো আজ বেন্ বেলা। ছোট ছেলেডার আবার জর আর ছদ্দি। তাই তোমার সয়াকে হাটে পাঠালাম, আমি বলি সইয়ের সঙ্গে কতদিন দেখা হই নি। ছেলেডাকে নিয়ে আর হাটের ভিড়ের মধ্যে ক'নে যাব, সইয়ের বাড়ী একটু বসি।

কথার ভঙ্গিতে মনে হইল দুলে কি বাগ্দীদের মেয়ে। আমার বোনের সহিত সই পাতান তাহার পক্ষে আশ্চর্য্য নয়, কারণ তাহারও শ্বশুরবাড়ী নিকটবর্ত্তী এক পল্লীগ্রামেই। ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য শহরের বাসায় থাকে।

দুপুরের ঘুম নষ্ট হইল। বোনের নবাগতা সখীটি লেখাপড়া ভাল করিয়া শিখিলে এ্যানি বেসান্ট হইতে পারিত। মুখের তাহার বিরাম নাই। অনবরত বকিয়া যাইতেছে, এবং কথার

ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে ছেদস্বরূপ বলিতেছে, সই, একটা পান দেবা ?······দোক্তা খাও না ? তা দ্যাও একটা এমনি পানই দ্যাও। ও হাবলা, এই তোর সেই সই-মা, চিনতে পেরিলি, হ্যাঁরে বোকা ছোঁড়া ? গড় করলি নে যে সই-মাকে ? নে, পায়ের ধুলো আর নিতি হবে না, এমনি গড় কর।

পান খাইয়া সে আবার সুরু করিল, ঘরের কত ভাড়া দ্যাও, হ্যাঁ সই ? তের টাকা ? ও মা, ক'নে যাব ? তা কি দরকার তোমার শহরে এত টাকা খরচ করে থাকবার, হ্যাঁ সই ? দিব্যি তোমার ঘরডা, বাড়ীডা রয়েচে গেরামে। আম কাঁটাল গাছগুলো দেখা অবানে নষ্ট হয়ে যাবে। ন্যাও সই, মেয়ে যেন তোমায় চাকুরী করে নিয়ে খাওয়াবে লেখাপড়া শিখে, হি হি—হি হি—বলিয়া সে হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে আর কি !

আমার শোবার ঘরের বাহিরের রোয়াকে তাহার হাসি ও বক্তৃতা চলিতেছে, তা-ও এমন উচ্চকণ্ঠে যে, কলিকাতা শহরে হইলে ফুটপাথে ভিড় জমিয়া যাইত। আমি একে কাল রাত্রে মশার উপদ্রবে তেমন ঘুমাইতে পারি নাই, এমন বিপদও আসিয়া জুটিল ঠিক কিনা দুপুর বেলাতেই। ছোট বাসা, অন্য কোন ঘরও নাই যে সেখানে গিয়া ঘুমাই।

—ও সই, ছেলেডাকে একটু জল দ্যাও দিকিন্, অনেকক্ষণ থে খাবে বলচে। তা ওর আবার লজ্জা দেখলে হয়ে আসে ! জল চা'বি তোর সই-মার কাছে, তার আর লজ্জা দেখ না ছেলের ?

আমার বোন জল আনিতে ঘরের মধ্যে ঢুকিলে সে চুপিচুপি তাহার ছেলেকে আশ্বাসের সুরে বলিতেছে শুনিলাম—তোর সই-মা কি তোরে এমন্নি জল দেবে ? কিছু খাতি দেবে অখন

দেখিস্। দেখি? পেটটা পড়ে রয়েচে, অ মোর বাপ, সেই সকালে দুটো পান্তা খেয়েলো, আহা। পাটালি হাটে বিক্রী হলি চাল কিনে নে যাব, এ-বেলা ভাত রাঁধব অখন। এখন তোমার সই-মা যা খাতি ছায়, তাই খেয়ে থাক। পয়সা নেই যে, মাণিক।

এই সময় আমার বোন জল এবং বোধ হয় বাটিতে একটু গুড় লইয়া রোয়াকে গিয়া উপস্থিত হইল—কারণ শুনিলাম সে ছেলেটিকে বলিতেছে—নে, হাবলা, হাত পাত, গুড়টা খেয়ে জল খা। শুধু জল খেতে নেই।

হাবলা ও হাবলার মা যে একটু নিরাশ হইয়াছে, ইহা আমি তাহাদের গলার সুর হইতেই অনুমান করিলাম। হাবলার মা নিরুৎসাহভাবে বলিল, নে, গুড়টুকু হাতে নে। খেয়ে ফেল্। যেন রোয়াকে না পড়ে—

ঠিক দুপুরের পরই সময়টা, এখন যে কিছু খাইতে দেওয়া প্রয়োজন, এ-কথা আমার বোনের মাথায় আসে নাই বুঝিলাম। তা ছাড়া পল্লীগ্রামে এ-রকম নিয়মও নাই।

—ভাল কথা সই, তোমার জন্যি ভাল নক্কার বীজ এনেলাম। এই মোর আঁচলে বাঁধা ছেলো, তা রাস্তার মাঝখানে কোথায় পড়ে গিয়েচে। বাসায় জায়গা আছে গাছপালা দেবার? আসচে হাটবারে আবার নিয়ে আসব।

এই সময়ে আমার ছোট ভাগ্নে স্কুল হইতে ফিরিল। টিফিনের ছুটি হইয়াছে, সে সকালে খাইয়া যাইতে পারে নাই বলিয়া ভাত খাইতে আসিয়াছে।

—ও টুলু, চিনতে পার তোমার সই-মারে? হি হি, ও মা, ছেলে এরি মধ্যে কত বড় হয়ে গিয়েচে মাথায়। গায়ে এটা কি, জামা? বেশ জামাটা।

আমার ভাগিনেয় এই বয়সেই একটু চালবাজ। গ্রাম হইতে আগত এই সই-মাকে দেখিয়া সে যে খুব খুসি হইয়া উঠিয়াছে, এমন কোন লক্ষণ তাহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইল না। তাহার সই-মা বলিল, বেশ জামাটা টুলুর গায়ে। টুলুর আর কোন ছেঁড়া-ছাটা জামা-টামা নেই, হ্যাঁ সই? ছেলেডা এই শীতি আতুড় গায়ে থাকে। তোমার সয়া এবার অসুখে পড়ে গাছ কাটতে পারে নি। মোটে দশটা গাছে যা রস হয়, তাই জ্বাল দিয়ে সের আড়াই পাটালি হয় হাটুরা হাটে। পাটালির দর নেই তার ওপর, ছ'পয়সা আট পয়সা সের। ওই থেকে চাল ডাল, ওই থেকে সব। গাছের আবার খাজনা আছে। ছেলেডাকে একখানা দোলাই কিনে দেব দেব ভাবচি আজ তিন হাট, কোথা থে দেই বল দিকিন্ সই? কি রে—কি? হুঁ, উ, উ? ছেলের আবার আবদার দেখ না?

আমার বোন বলিল, কি? কি বল্‌চে হাবুল?

—ওর কথা বাদ দ্যাও সই। রাস্তা দিয়ে ওই যে মিন্সে চিনির কি বলে ও-গুলো—

হাবুল বলিল—গোলাপছড়ি।

—তা যে ছড়িই হোক, ওই ওঁকে কিনে দিতে হবে। না, ও খায় না। কি ছড়ি? গোলাপছড়ি? হি হি, নাম দেখ না?—গোলাপছড়ি।

আমার ভাগ্নের দৃষ্টিও বোধ হয় ইতিমধ্যে গোলাপছড়ির দিকে পড়িয়াছিল। সে ছুটিয়া ফিরিওয়ালাকে ডাকিয়া আনিল ও আমার

কাছে সটান আসিয়া বলিল—গোলাপছড়ি কিনব, মামা। পয়সা দাও।

বোধ হইল হাবুলও কিছু ভাগ পাইয়াছে, কারণ একটু পরেই হাবুলের মায়ের খুসিভরা গলার সুর শুনিতে পাইলাম—খাও, হ'ল তো? কেমন, বেশ মিষ্টি? খাও। পাটালিব চেয়ে কি বেশী মিষ্টি? দেখি দে তো একটু গালে দিয়ে? কি জানি, এ-সব কখনও দেখিও নি চক্ষে।

একটু পরে টুলুকে ভাত দিতে তাহার মা রান্নাঘরে চলিয়া গেল। সেই সময়ে শুনিলাম, হাবুল নাকিসুরে বলিতেছে, না, মা, হুঁ। আর তোমারে দেব না। আমি তবে কি খাব?

হাবুলের মা তাহার সইকে আর পাইল না, কারণ ছেলেকে খাওয়াইয়া স্কুলে পাঠাইয়া দিয়া নিজে ঘরের মধ্যে বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে। অনুপস্থিত সইয়ের উদ্দেশ্যে হাবুলের মা আপন মনে অনেক গল্প করিয়া গেল। খানিক পরে শুনিলাম বলিতেছে—ও সই, ক'নে গেলে? ঘুমুলে না কি? মোরে আর একটা পান দেবা না?

কেহ তাহার কথার উত্তর দিল না।

বেলা তিনটা বাজিয়াছে। আমি বেড়াইতে বাহির হইতে গিয়া দেখি অতিমলিন সাড়ি পরনে এক বাইশ তেইশ বছরের কালো-কালো মেয়ে একটা চুপড়ি পাশে রাখিয়া ঠিক পৈঁঠার কাছে বসিয়া আসে। তার ছেলেটিও কাছেই বসিয়া তখনও গোলাপছড়ি চুষিতেছে। আমাকে দেখিয়া মেয়েটি থতমত খাইয়া মাথায় ঘোমটা তুলিয়া দিল। দুপুরের বিশ্রামের ব্যাঘাত হওয়ায় মনটা বিরক্ত ছিল, একটু রুক্ষ সুরেই বলিলাম—একটু সরে ব'স পথ থেকে। চুপড়িটা রাস্তার ওপর কেন?

মেয়েটি ভয়ে ও সঙ্কোচে জড়সড় অবস্থায় চুপড়ি সরাইয়া এক পাশে রাখিয়া নিজে যেন একেবারে মাটির সহিত মিশিয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু আগে উকীলদের ক্লাবে টেনিস খেলিয়া বাসায় ফিরিতেছি, দেখি বাসার পাশে বড় রাস্তার ধারে তুঁতলার শুক্‌নো পাতার উপরে আমার বোনের সই তাহার ছেলেটিকে লইয়া বসিয়া আছে। পাশে সেই চুপড়ি ও একটা ছোট ময়লা কাপড়। সন্ধ্যা হইবার দেরি নাই, তুঁতগাছের মগডালেও আর রোদ দেখা যায় না। হাবুলের বাপ এখনও পাটালি বিক্রী করিয়া হাট হইতে ফিরে নাই। মেয়েটি যেন কেমন ভরসা-হারা নিরাশ মুখে বসিয়া আছে, অন্ততঃ তেমন হাসিখুসির ভাব আর দেখিলাম না।

আগ্নেয়-গিরি

প্রবোধকুমার সান্যাল

'বাঙালীর শিক্ষা, বাঙালীর সভ্যতা, বাঙালীর সংস্কৃতি একদিন সমগ্র ভারতের মুখোজ্জ্বল করেছিল, আজো তার ব্যতিক্রম হবে না; আজো বাঙলার আকাশে, বাঙলার মাঠে, বাঙলার নদীতে নদীতে— এমনি কিছু একটা গুছিয়ে লেখো না হে, একটা কলম্ অন্তত ভরিয়ে দেওয়া চাই, বুঝলে? রাত প্রায় সাড়ে দশটা বাজে, ফিরতে হবে। তোমার বৌদিদির জ্বর দেখে' বেরিয়েছি।—নাও, আরম্ভ ক'রে দাও।—বলিয়া সম্পাদক মহাশয় নিজের টেব্‌লে গিয়া বসিলেন।

কোন্ কথা দিয়া প্রথমে আরম্ভ করিব তাহাই বসিয়া ভাবিতেছিলাম। আমার বিদ্যা সামান্য, কল্পনা যৎসামান্য, কিন্তু বাঙালীর যশ গাহিতে গেলে ইহাতেই চলিয়া যাইবে, এই মনে করিয়া শাদা কাগজ লইয়া বসিলাম।

ও কি হে, প্রস্তরীভূত কেন? সম্পাদক মহাশয় পুনরায় আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, উৎসাহ সেই, কেমন? কি করেই বা থাকবে বলো। বসে থাকতে পারোনি তাই ব্যাগার খাটতে এসেছ কাগজের অফিসে। তিরিশ টাকা পেতে, তাও বন্ধ। 'যা বলি তাই শোনো, দুধে জল মিশিয়ে দাও, বুঝলে? কেউ ধরতে পারবে না। লেখো লেখো, আর্টের পৃষ্ঠাটা ভরাতে হবে ত!—হ্যাঁ, এই যে, কি চাই নরেনবাবু! কাপি? দিচ্ছি দাঁড়ান্,—আচ্ছা, পনেরো মিনিট বাদে আসবেন। লেখা আর আসছে না নরেনবাবু, বিজ্ঞাপনগুলো ছড়িয়ে সাজান্, জায়গা ভরে যাবে।

নরেনবাবু চলিয়া গেল। এইবার দ্রুত আরম্ভ করিবার চেষ্টা করিলাম। 'বাঙালীর শিক্ষা, বাঙালীর সভ্যতা, বাঙালীর,'—কি চাই সুকুমারবাবু?

সুকুমার কহিল, ক্ষিতীশবাবুর মৃত্যু সংবাদটা—

সম্পাদক কহিলেন, হ্যাঁ, তার ব্লকটাও দিয়ে দাও। 'ব্যানার, টাইটেল, কিছু দরকার নেই। লিখে দিয়ো, 'সাংবাদিকের অকালমৃত্যু, পরলোকে ক্ষিতীশ দাস'। কী রোগ যেন হয়েছিল তার? আমাদের এখানে প্রায় ছয় বছর চাকরি করেছিল, না হে সুকুমার?

সুকুমার কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, যক্ষ্মায় মারা গেছেন। আপনি কি তাঁর সম্বন্ধে সম্পাদকী লিখবেন?

কী লিখবো?—সম্পাদক কহিলেন, কোনো অর্থ নেই, সুকুমার। আমরা কাগুজে লোক, যাদের কখনো চোখেও দেখিনি, যারা আমাদের একটি কানাকড়িও উপকার করেনি, তাদের মৃত্যুতে কাঁদি হাউ হাউ ক'রে; চোখের জলে কাগজ ভেসে যায়। শোক সংবাদ নিয়ে খেলা করি, অভিধান হাতে নিয়ে ভাবি কোন্ কথাটা বসালে বেশ করুণরস সৃষ্টি হবে। সুকুমার, সব মিথ্যে, সমস্ত ফাঁকি। হ্যাঁ, ক্ষিতীশের ওপর কিছু লেখা হবে না, কেঁদে কী লাভ? ওসব আমি পারবো না ভাই, আন্তরিক দুঃখের কথা লেখা বড় কঠিন, রং চড়িয়ে লিখতে আমার লজ্জা করে। তুমি যাও।

আমি তখন প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি। আরম্ভ করিলেই কলম আপনা হইতে চলিতে থাকে। তখন শুধু বাঙালী কেন, মেমেল্ অথবা লিলিপুটিয়ানদেরও ঐতিহ্য ইতিহাস অবাধে লিখিয়া যাইতে পারি।

সম্পাদক ফস ফস করিয়া তাঁহার কাগজে লিখিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে কখনো ভাবিতে দেখি নাই, কলমের ডগায় তাঁহার লেখা বসিয়া থাকে, ডাকিলেই আসে। লিখিতে লিখিতে এক সময়ে তিনি মুখ তুলিলেন, কহিলেন, ওহে ও দাদু ?

তাঁহার দিকে ফিরিলাম। তিনি আকাশপাতাল ভাবিয়া হঠাৎ কহিলেন, ক্ষিতীশের চিকিৎসা কিছুই হয় নি, না হে ? চল্লিশ টাকা মাইনে নিয়ে সংসার চালানো কঠিন, তার ওপর এই যোড়া রোগ।

বলিলাম, শেষের দিকে মাইনে সে পায়নি বড়বাবু।

চুপ, চেঁচিয়ো না, সব মনে আছে। কে দেবে মাইনে, শুনি। ম্যানেজিং ডিরেক্টর কংগ্রেস নিয়ে ব্যস্ত। টাকা চাইলে তিনি দেনা দেখিয়ে দেন্। সেদিন প্রেসের লোকেরা ধর্ম্মঘট করলে, তার জন্যে আমার লাঞ্ছনার আর অবধি রইলো না। আচ্ছা, তুমি জানো, ক্ষিতীশের স্ত্রীর প্রভিশনের কোনো বন্দোবস্ত আছে কিনা ?

বলিলাম, গরীবের মেয়ে, স্বামী ছিল গরীব—

অর্থাৎ কিছু নেই, কেমন ? আহা, বেঁচে গেছে ছোক্‌রা, বড় দুঃখ পাচ্ছিল। কী নোংরা ঘরে থাক্‌ত ; আলো নেই, একটু ভালো খাওয়া নেই,—দুর হোকগে, লিখে দাও, 'তার মৃত্যুতে 'স্বাধীনতা' পত্রের সকল কর্ম্মীরা সবিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন ! যে তিন মাসের মাহিনা তাঁহার বাকি আছে তাহা আদায় করিয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টারের বৌদিদির সম্মানার্থে টী-পার্টি দেওয়া হইবে।' না কি বলো হে ? তুমি ত তার খুব বন্ধু ছিলে। ওই টেবলটায় বসতো না সে ?

বলিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওই যে এখনো পিঠের দাগ রয়েছে ; তার প্রিয় কলমটা, তার দোয়াত। ব্লটিংয়ের ওপর পাখী আঁক্‌তো সে ব'সে ব'সে,—ওহে নিরঞ্জন, আরে শুনে যাও হে, তোমাদের ওয়ার্ড থেকে কে কে দাঁড়াচ্ছে ?

নিরঞ্জন, থামিয়া কহিল, মদনমোহন পাল।

তাই নাকি ? ওর এত টাকা হোলো কবে ? পারবে ম্যানেজ কর্‌তে ? ক'খানা মোটর ভাড়া করেছে ? ক'জন ক্যান্‌ভাসার ? নিরঞ্জন কহিল, সে অনেক বড়বাবু।

বড়বাবু কহিলেন, সে অনেক বেশ বেশ, লোকটা কিন্তু খুব সাচ্চা। নতুন আইডিয়াজ্‌ আছে, খুব ভদ্র। হবে না ? বনেদী বংশ যে।

নিরঞ্জন কহিল, হাজার ত্রিশেক টাকা খরচ করবে।

বলো কি হে, তিরিশ হাজার ? আমাদের কাগজে কিছু ঢালুক না, তুলে ধরবো খুব। ডবল কলমে নাম ছাপবো।

নিরঞ্জন কহিল, তা বুঝি জানেন না ? আমাদের ডিরেক্‌টারের বন্ধুর সঙ্গে তাঁর আদায়-কাঁচকলায়।

তাই নাকি ? তবে ত এক হাত নিতে হবে ? বলিয়া বড়বাবু ঘণ্টা বাজাইলেন। বেয়ারা আসিয়া হাজির হইল। তিনি কহিলেন, উমাপদবাবুকে ডাকো।

উমাপদবাবু আসিল। বড়বাবু কহিলেন, ইলেক্‌শনের খবর আপনি এডিট্‌ করেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মদনমোহন পালের বিরুদ্ধে কে দাঁড়িয়েছে জানেন ?

উমাপদ বাবু কহিল, হরিদাস ঘোষ।

সম্পাদক কহিলেন, হরিদাসবাবুকে তুলবেন খুব,—যান্। আর ওই ব্যাটা মদনমোহনকে—বুঝলেন না? বেশ মাঝে মাঝে দু'এক ঘা—

উমাপদ চলিয়া যাইবার পর কহিলাম, কিন্তু হরিদাস বাবুর কোনো পরিচয় ত আমরা·········দেশের তিনি কী করেছেন?

করেছেন আমার মুণ্ডু। বড়বাবু একটু থামিয়া কহিলেন, টাকা আছে তাঁর, বুঝলে? টাকা টাকা,— কালকেই দেখতে পাবে তাঁর কাছ থেকে মোটা টাকার চেক্ এসে হাজির।

নিরঞ্জন বলিল, তাতে আমাদের সুবিধে কি বড়বাবু?

সুবিধে? টাকা পেয়ে ডিরেক্টর খুশি হবেন, এই সুবিধে। চাই কি, নগদ এক মাসের বাকি মাইনেও পেয়ে যেতে পারি।

বলিলাম, সে ত' আমরা পাবোই, বড়বাবু।

না, কাগজের চাকরির টাকা পাওয়া যায় না, ওটা পিছু পড়লেই বাঘে খায়! না দিলে কি করবে? নালিশ? কা'র নামে? লিমিটেড কোম্পানী যে। দেবে লিকুইডেশনে! দেনা দেখিয়ে দেবে দশগুণ। তুমি পাবে ফাইভ্ পারসেন্ট্।—এই যে নরেনবাবু আসুন, কাপি রেডি।

বড়বাবু ইহারই মধ্যে কখন্ কাপি লিখিয়াছেন তাহা আমরা কেহই বুঝিতে পারি নাই। নরেনবাবু কয়েক খানা প্রুফ লইয়া ফাইল্ করিয়া গেলেন।

আর শুনুন। বড়বাবু তাঁহাকে পুনরায় ডাকিলেন, বলিলেন, শেষ পৃষ্ঠায় কালকে 'ক্রষ্টিনার' ছবিটা যাওয়া চাই, অত বড় বিলেতী জাহাজ ডুবির খবর, যেন ভুলবেন না, ওর সম্বন্ধে এডিটোরিয়াল্ রইল। ও দাদু, তোমার কতদূর? তুমি দেখছি আজ আমাকে

ভোগাবে। তাই ত, স্ত্রীর অসুখ দেখে বেরিয়েছি। কি হে সুকুমার, আবার কি চাই ?

সুকুমার একটি 'ইউ-পির' সংবাদ আনিয়া কহিল, এ খবরটা কি আজ চালিয়ে দেবো ?

বড়বাবু কাগজখানা লইয়া কহিলেন, ওঃ, সেই হরিজন বালিকার রহস্যময় মৃত্যু! যজ্ঞেশ্বর তীর্থে সনাতন হিন্দু মন্দিরের চৌকাটে মাথা রাখিয়া কুসুমসুন্দরী নামক এক বালিকার দেহত্যাগ!

উঠিয়া দাঁড়াইয়া রুদ্ধশ্বাসে কহিলাম, সত্যি ঘটনা বড়বাবু, আমি জানি, ছিলুম সেখানে। সে যে কত বড় ট্রাজেডি—

বড়বাবু হাত নাড়িয়া কহিলেন, বসো তুমি, হৃদয়াবেগের জায়গা খবরের কাগজের অফিসে নেই, ওটা মেরে আসতে হয়। ট্রাজেডির তুমি কী জানো ? রোগে ভুগে মরেছে ঠাকুরের দরজায়, এই মাত্র! একে ট্রাজেডি বলে না, মৃত্যু মানে ট্রাজেডি নয় হে।

তাঁহার মুখের দিকে আমরা সকলে তাকাইলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, ট্রাজেডি আমাদের জীবনে, কারণ আমরা বেঁচে আছি! তুমি, আমি, নিরঞ্জন, সুকুমার, নরেন—এরা ট্রাজেডি; এরা না খেয়ে কাজ করে, উপবাস করে হাসে, যাদের কাছে অপমানিত হয় তাদের তোষামোদ করে! মৃত্যুটা চরম কথা, শান্তির কথা,—কিন্তু আমরা যারা টিঁকে আছি, যাদের পরিবারে গভীরতর অসন্তোষ—যাদের ভাইরা বেকার, সন্তানরা স্বাস্থ্যহীন, স্ত্রীরা রুগ্ন, চাকরির জন্যে যারা কুকুরের মতন দরজায় দরজায় লাথি খেয়ে,—যাও সুকুমার এখান থেকে, সঙ দেখ্‌ছ, কেমন ? যাও ইলেকশনের খবরগুলো ভালো ক'রে সাজিয়ে ছাপো গে। 'হরিজন বালিকা' ব'লে মড়ার গায়ে ছাপ মেরে দিয়ো না, হরিজন মানে হিন্দু!

সুকুমার চলিয়া গেল। টেবলের সম্মুখে এতক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া নিবারণ লিখিয়া যাইতেছিল, এতক্ষণে তাহার উপর বড়বাবুর নজর পড়িল। কহিলেন, ওহে ছোটবাবু—

সহকারী সম্পাদক বলিয়া আমরা সকলেই নিবারণ বাবুকে 'ছোটবাবু' বলিয়া ডাকি। নিবারণ মুখ তুলিয়া কহিল, কি বলুন ?

বড়বাবু বলিলেন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর আমার বাড়ীতে গিয়েছিলেন। গিয়ে জানালেন, এই 'স্বাধীনতা' কাগজের জন্ম তাঁর পঁচিশ হাজার টাকা দেনা। আমাকে বললেন, ষ্টাফের খরচ কমানো যায় কি না। আমি বললাম, না। কেউ পায় ত্রিশ, কেউ চল্লিশ, তুমি পাও পঞ্চান্ন, আমি একশো,—এর ভেতর খরচ কমাবো কা'র থেকে ? আমার নিজের মাইনে তোমাদের চেয়ে বেশি, একশোর কমে আমি থাকতে পারব না, আমার সাতটি ছেলেমেয়ে, বাড়ী ভাড়া, পথ খরচ। মাইনে বাড়ানো চুলোয় যাক্, কমাবো কোন্ মুখে ? দরিদ্রকে বঞ্চিত করবো? কিন্তু নিবারণ, তোমার গতিবিধি দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে।

কেন বড়বাবু ?

বড়বাবু কহিলেন, আমাদের প্রেস-ম্যানেজারের সঙ্গে তোমার ভারি ভাব। আমি জানি আমার বিরুদ্ধে তোমরা দুজনে কী যেন একটা পরামর্শ করো।

কী বলছেন আপনি ? আপনার বিরুদ্ধে পরামর্শ ? এমন অন্যায় সন্দেহ কবে হোলো আপনার ?

আঃ, থামো। তোমার গলার আওয়াজ শুনলে এদের মনে হবে, তুমি বুঝি সত্যিই কিছু জানো না! তুমি সব জানো নিবারণ। আমার এই একশো—আমার প্রতি তোমাদের দুজনের একটা

গভীর ঈর্ষা আছে।—বড়বাবু বলিলেন, তোমরা দু'জনে আমাকে লুকিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে নিয়মিত যাও। কেন যাও? স্তব, স্তুতি করতে? তাঁকে তোমরা জানিয়ে এসেছ যে, তোমরা খরচ কমাতে পারো! কেমন এই না? বাঙালী জাত গোয়েন্দাগিরি করতে ওস্তাদ; ক্ষুদ্রচেতা, পরশ্রীকাতর! নিজে বাঁচবে না, অন্যকে বাঁচতে দেবে না। You will not grow yourself and won't allow others to grow. জাতের জীবনে যক্ষ্মা ধরিয়ে দিলে কুচক্রী ভবানন্দর দল! বলিয়া সম্পাদক মুখ ফিরাইলেন।

নিবারণ কহিল, এর পরে আপনার সঙ্গে কথা কওয়া চলে না। আপনার মুখের সংযম নেই।

কেমন ক'রে থাকবে? জানো তুমি কর্ত্তৃপক্ষের সামান্য 'ফেবার' পাবার আশায় তোমার বন্ধুদের কত বড় সর্ব্বনাশ করছ? তাঁর যদি পঁচিশ হাজার টাকা দেনা হয়, তার জন্যে কি আমরা দায়ী?

এইবার নিবারণ কহিল, কিন্তু আমরা যদি 'স্বাধীনতা'র জন্যে কিছু স্বার্থত্যাগ করি, তবে কি কাগজখানা বাঁচতে পারে না?

বড়বাবু কহিলেন, কাগজ বাঁচাবার জন্যে স্বার্থত্যাগ করবে? সে ত্যাগটা কেমন? যারা ভিকিরী, যারা নিরন্ন তাদের আবার ত্যাগ কি? তুমি যা মাইনে পাও, তার থেকে পাঁচ টাকা কমালে তোমার চল্‌বে কেমন করে?

আমার চল্‌বে, বড়বাবু।

তোমার চলবে কিন্তু ওদের চলবে না। ওরা কেউ পায় পনেরো, কেউ কুড়ি, কেউ তিরিশ। যারা দু'লাখ পাঁচ লাখের কারবার করে, তাদের দশ বিশ হাজার গায়ে লাগে না, কিন্তু যাদের কুড়ি টাকা থেকে পাঁচ টাকা যায়, তারা জানে এই লোকসান কত বড়!

নিবারণ কহিল, আমরা সহ-সম্পাদকরা যদি বাজার থেকে কিছু কিছু বিজ্ঞাপন আদায় ক'রে আনি, তাহ'লে ত কাগজখানার কিছু সুবিধে হয়!

হা ভগবান! বড়বাবু কহিলেন, এই মন্ত্র দিয়েছে তোমাকে ম্যানেজার, কেমন? তোমরা আন্‌বে বিজ্ঞাপন আদায় করে, এমন নিয়ম কোনো শাস্ত্রে নেই! কেন আন্‌বে? কেন জাত খোয়াবে? তুমি সাব-এডিটর, তোমার সম্মান আছে। তুমি যদি বিজ্ঞাপন আনো, তবে ম্যানেজার আছেন কোন কাজ নিয়ে? তাঁর অকর্ম্মণ্যতা আমরা ঢাকতে যাবো নিজেদের মাইনে কমিয়ে? কিছুতেই নয়। এই কাগজের ব্যবসার দিকটা তাঁর হাতে, এর লাভ-লোকসানের জন্যে তিনি দায়ী,—একজনের অক্ষমতার জন্যে এতগুলি লোক দুঃখ পাবে? না, সে আমি হ'তে দোবো না। নিবারণ, তুমি আমার শত্রুতা করতে পারো, আমার বিরুদ্ধে গোপনে তুমি গিয়ে ডিরেক্‌টরকে প্রভাবান্বিত করতে পারো—কিন্তু আমার ডিপার্টমেণ্টের কারো মাইনে আমি কমাবো না। কারণ তারা দরিদ্র, তারা সকলেই অভাবগ্রস্ত!

নিবারণের চেহারাটা আজ আমাদের সকলের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার দোষ নাই। ডিরেক্‌টরের স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিতে পারিলে চাই কি অন্যত্র ভালো কোনো চাকরি মিলিয়া যাইবে। তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি; তাঁহার দল আছে, দলাদলি আছে; কংগ্রেসে, কর্পোরেশনে ও কাউন্সিলে তাঁহার বিশেষ প্রভাব। নিবারণ বড়গাছেই নৌকা বাঁধিয়াছে।

টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; বড়বাবু রিসিভারটা তুলিয়া কানের কাছে ধরিলেন—হ্যালো। ও, আপনি? হ্যাঁ, বলুন?

পোলিং-ডেট্ পঁচিশে ? আচ্ছা জানিয়ে দেবো। আপোষ হয়েছে ? কন্‌ডিশন্ গুলো কি ? কালকের রেজোলিউশন ? হ্যাঁ, ছাপবো। আসবেন নাকি এখানে ? আচ্ছা ঘণ্টাখানেক থাক্‌ব। কি বলছেন, নমিনেশন্ পেয়েছে ? খয়ের খাঁ, বুঝলেন না ? বাংলা-দেশে অনেক বিভীষণ আছে। আচ্ছা আসবেন, আমি আছি।

বড়বাবু টেলিফোন্ ছাড়িয়া দিলেন।

'এই বাংলাদেশেই একদিন রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বাংলায় আজিও রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্র শীল জীবিত। অধ্যাত্মজগতে রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ ; সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথ, জাতীয় জীবনে চিত্তরঞ্জন। বাঙালীর সাধনা, বাঙালীর ত্যাগ, বাঙালীর বিদ্যা—'

দ্রুতহস্তে আমি লিখিয়া যাইতেছিলাম। এমন সময় বাহিরে সাড়া পড়িয়া গেল! ম্যানেজিং ডিরেক্‌টর রাসবিহারী মুখার্জ্জি আসিয়াছেন। আমরা সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নিবারণ তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল, আমরা হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া পুনরায় নিজেদের কাজে বসিয়া গেলাম।

রাসবিহারীবাবু সম্পাদকের কাছে গিয়া বসিলেন। হাসিয়া কহিলেন, আজকে তোমার লীডার খুব ভাল লেগেছে ধনঞ্জয়।

বড়বাবু হাসিয়া উত্তর দিলেন,—খেতে না পেলেই পাখীর গলা মিষ্টি হয় মিষ্টার মুখার্জ্জি।

সে কি হে ?—বলিয়া রাসবিহারীবাবু একটু লজ্জিত হইয়া আমাদের সকলের দিকে একবার তাকাইলেন। পুনরায় কহিলেন,

এ মাসের দরুণ কিছু টাকা স্যাংশন্ করেছি, তোমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নিয়ো। বড় টানাটানি বুঝলে ধনঞ্জয়।

বড়বাবু কখনো চক্ষুলজ্জা করিয়া কথা বলেন না। কহিলেন, নিজেদের অভাব এত বড় যে, আপনাদের টানাটানির কথা মনেই হয় না, মুখুজ্যে মশাই। আমি এদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি টাকা পাই, খাতা-কলমেই এটা লেখা আছে। কিন্তু এমাসের পুরো মাইনে আজ পর্য্যন্ত চোখে দেখলুম না। এরা পরিশ্রম করবে কী খেয়ে? এদের উৎসাহ দেবো কী ব'লে? আপনি থাকেন চৌরঙ্গীর এক বিরাট অট্টালিকায়, আপনাকে কেমন ক'রে বোঝাবো তাদের প্রতিদিনের দারিদ্র্য, যারা আপনার ছাপাখানার মধ্যে ব'সে হরপ সাজায়? প্রত্যেক মাসের মাইনে তারা পায় না,—কোনোদিন দু'টাকা, কোনোদিন তিনটাকা, তাও ধর্ম্মঘট করবার ভয় দেখিয়ে আদায় করে।

রাসবিহারীবাবু হাসিয়া কহিলেন, ধনঞ্জয়, তুমি উত্তেজিত হয়েছ। কিন্তু দেশে কারবারের অবস্থা তোমার জানা নেই। চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন; গভর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য—আইনকানুন আমাদের হাতে নেই—

কী করব শুনে?—ধনঞ্জয় বললেন, তবু ত দেখছি ক্রোড়পতির দল স্বার্থসাধনায় মসগুল। আপনারা দলপুষ্টি করেছেন, পার্টি দিচ্ছেন, যাচ্ছেন কর্পোরেশনে-কাউন্সিলে ক্ষমতার লোলুপতায়। আপনার বিরাট জমীদারী, প্রকাণ্ড কারবার, ব্যাঙ্কে লক্ষ লক্ষ টাকা, —ঈর্ষা করিনে, ঘৃণা করিনে, কিন্তু আমাদের খেতে দিন, সম্ভ্রম বাঁচাতে দিন, আমরা শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। আমাদের মা-বোন আছে, স্ত্রী আছে, সন্তান আছে।

মুখুজ্যো মশাই বলিলেন, তবে যে নিবারণ আমাকে ব'লে এলো—

সম্পাদক উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, নিবারণ আপনার খরচ বাঁচিয়ে আপনার সুনজরে পড়তে চেষ্টা করেছে। ও কি চায় জানেন? আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রে আমাকে এখান থেকে সরাতে চায়—

নিবারণ চটিয়া উঠিল, কহিল, এ সমস্ত কিন্তু ব্লাস্‌ফেমি,—আমার কোনো দোষ নেই। আমার প্রতি এরকম ইন্‌স্‌ল্ট্, আমি কিন্তু—আমি কিন্তু এ চাক্‌রি ছেড়ে দেবো, মিষ্টার মুখার্জ্জি।

রাসবিহারীবাবু মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, থামো, চাক্‌রি ছাড়ার ভয় দেখিয়ো না, দেশে বেকারের অভাব নেই, ডাকলেই একজন জুটে যাবে তোমার বদলে। কিন্তু ধনঞ্জয়কে আমি ছাড়তে পারব না, মনে রেখো নিবারণ। সত্যিই কি ওর বিরুদ্ধে তুমি—?

মোটেই নয়, মিষ্টার মুখার্জ্জি।—বলিয়া একটা আর্ত্তনাদ করিয়া নিবারণ বসিয়া পড়িল।

ধনঞ্জয়, একটা কথা কিন্তু তোমাকে রাখতেই হবে। নিজের মাইনে তুমি কমিয়ো না, কিন্তু আর সকলের মাইনে পাচ টাকা ক'রে না কমালে আমি আর লোকসান দিয়ে পেরে উঠিনে।—রাসবিহারীবাবু ধনঞ্জয়কে মিনতি করিলেন।

কী বলছেন আপনি? সে ওরা রাজী হবে কেন? আমি তাদের উপকার করতে পারিনে, বরং অনিষ্ট করব? না, মুখুজ্যে মশাই, তার চেয়ে আপনি অন্য সম্পাদক খুঁজে আনুন।—বলিয়া কলমটা টেব্‌লের উপর ফেলিয়া 'স্বাধীনতা' সম্পাদক হাত গুটাইয়া বসিলেন।

রাসবিহারীবাবু কহিলেন, তুমি আমার লোকসানটা দেখবে না, ধনঞ্জয়?

ধনঞ্জয়বাবু এবার নরম হইয়া কহিলেন, আমি যাঁর কাছে চাক্‌রি করি, তাঁর লোকসান আমার গায়ে লাগবে, সে আমি জানি। কিন্তু তার জন্যে দায়ী আমরা—গরীবরা হ'তে যাবো কেন, বলুন? লোকসানের জন্যে দায়ী আপনার ম্যানেজার, তাঁর যোগ্যতার অভাব, তাঁর আলস্য, তাঁর অপরিণামদর্শিতা। আপনারা কারবারের উন্নতি করুন, লোকসানের মাত্রা কমিয়ে আনুন। সংবাদপত্র মানেই ত ক্ষতি! সেই ক্ষতি আপনাকে স্বীকার করতেই হবে দলপতি হওয়ার গৌরব নিয়ে—ক্ষমতা আহরণের গোড়ায় আছে ত্যাগস্বীকার।—একটু থামিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন, মিষ্টার মুখার্জ্জি, 'স্বাধীনতা'র ভিতর দিয়ে গণতন্ত্র প্রচার করতে যাওয়াটাই ভুল হয়েছে, কারণ এ কাগজ যাঁদের, তাঁরা ধনিক সম্প্রদায়! এদেশের সব সংবাদপত্রই প্রায় ধনবানদের অধিকারে। কেউ জমিদার, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ রাজা-মহারাজা! তাঁদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে·········বুঝলেন না, আর যাই হোক, সোস্যালিজ্‌ম্ হয় না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হাতে ক্ষমতা যতদিন না আসবে, যতদিন অর্থসম্পদ্ সমানভাবে বিতরণ না হবে, ততদিন—

রাসবিহারীবাবু কহিলেন, কিন্তু 'স্বাধীনতা'য় এই কথাই ত লেখা হয়, ধনঞ্জয়।

করুণার হাসি হাসিয়া সম্পাদক কহিলেন, কে বললে, কাগজ বোধ হয় আপনি পড়েন না! দরিদ্রের জন্য কান্নাকাটি ছাপা হয়, কিন্তু আসল কথা মুখ ফুটে বলি নে। গভর্ণমেণ্টকে বরং সমালোচনা করতে পারি,, কিন্তু আপনাদের চটাতে পারি নে। জেল্ খাট্‌তে ভয় পাই নে, কিন্তু আপনাদের অসন্তোষের কারণ ঘটালে উপবাস ক'রে মরতে হবে স্ত্রীপুত্র নিয়ে।

কী যে বলো তুমি, ধনঞ্জয়! বলিয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টর একটু হাসিলেন। পুনরায় কহিলেন, তুমি কি বলতে চাও, দেশের সত্যকারের ব্যথা আমাদের কাগজে প্রকাশ পায় না?

না। সম্পাদক কহিলেন, আপনাদের কাগজে থাকে কেবল স্বরাজ পাবার কথা, হিন্দু মুসলমান ঐক্য, অনুন্নত সম্প্রদায়, এবং বড় জোর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা! কিন্তু এ ছাড়াও দেশ আছে। আমার মতন পঞ্চাশ লক্ষ বেকার কেবল এই বাংলাদেশেই উপবাসে মরছে; স্বাস্থ্যহীন, কোটি কোটি স্ত্রীলোক, কোটি কোটি নিরন্ন চাষী আর মজুর, দুর্ভিক্ষ আর মহামারী পীড়িত সহস্র সহস্র গ্রাম—এদের আর্তনাদ আপনার চৌরঙ্গীর অট্টালিকার দরজায় পৌঁছয় না। এদের হাতে ক্ষমতা এলে আপনাদের বিপদ, তাই এদের দুর্গম অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়ে আপনারা নিরাপদ জীবন যাপন করছেন। যাক্‌গে মিষ্টার মুখার্জ্জি, এ নিয়ে অনেক কথাই বলা যায়, আমাদের আবার রাত হয়ে গেল।

মিষ্টার মুখার্জ্জি অনেকক্ষণ বসিয়া কাগজপত্র নাড়া-চাড়া করিলেন, কিন্তু আসল কথাটা তিনি ভুলিলেন না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, তা হ'লে আমার প্রস্তাবে তুমি রাজি নও, ধনঞ্জয়?

সম্পাদক কহিলেন, আপনার প্রস্তাবে রাজি হ'তে গেলে আমার সমস্ত পলিসিকে নষ্ট করতে হয়, ভাঙতে হয় আমার আদর্শের মূল নীতি। ওটা আমি পারব না, মুখুজ্যে মশাই।

মুখুজ্যে মশাই কহিলেন, ধনঞ্জয়, সোনার ডিম পেতে গেলে হাঁসটাকে মারলে চলে না। কাগজ বাঁচলে তবেই লাভ, তবেই কারবার। তোমার পলিসিই বলো, আর আদর্শের মূলনীতিই

বলেন, সবাই 'স্বাধীনতা'র মরণ-বাঁচনে নির্ভর করছে। আচ্ছা, আমি এখন চললুম!

সম্পাদক কহিলেন, নমস্কার।

নমস্কার লইয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টর বাহির হইয়া গেলেন। নীচে তাঁহার মিনার্ভা কার্ দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

সম্পাদক ডাকিলেন, নিবারণ?

নিবারণ মাথা তুলিলেন। সম্পাদক পুনরায় কহিলেন, কাগজখানা তুমি চালাতে পারো?

কোন্ কাগজটা? দেখুন ধনঞ্জয়বাবু, আপনার সোজাবাঁকা কোনো কথাটারই আমি মানে বুঝতে পারি নে।

ক্রমশ বুঝবে তুমি সবই, একটু দেরিতে বোঝ—সরল কিনা? বল্‌ছি যে, তুমি যদি স্বাধীনতা'র সম্পাদক হও, চালাতে পার্‌বে?

নিবারণ কহিল, ও সব বাজে কথা আমি ভাবি নি।

আচ্ছা ভাবোই না একবার। ধরো পুলিশ আছে, প্রেস-অফিসার আছে, জনসাধারণ আছে, কংগ্রেস আছে, তার ওপর আছেন রাসবিহারীবাবুরা—সবাইকে খুশি রাখতে পারবে? এদের মধ্যে একজন চটলেই তোমার চাকুরি আর কাগজ যাবে গোল্লায় মনে রেখ। সম্পাদক তাঁহার তর্জ্জনী তুলিলেন।

মুখের একটা শব্দ করিয়া নিবারণ কহিল, চাকুরি রাখ্‌তে হয় কেমন ক'রে সে ত' আপনিই ভালো জানেন। যাক্‌গে আমার কাজ হয়ে গেছে, আমি চল্‌লুম, নমস্কার। বলিয়া সে কেমন যেন অন্তরের জ্বালা প্রকাশ করিয়া সেদিনকার মত তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

রাত অনেক হইয়াছে। কাগজপত্র গুটাইয়া, সুকুমার-নরেন-নিরঞ্জন প্রভৃতিকে উপদেশ দিয়া সেদিনের মতো বড়বাবুও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার স্ত্রীর অসুখ, আর দেরি চলিবে না। ছাতাটা লইয়া আমার নিকট আসিয়া কহিলেন, কি হে, তোমার যে এখনো শেষ হয়নি, কী ভাবচো?

আমার তখন আর একটু বাকি ছিল। বড়বাবু কহিলেন, দেখো ভাই যেন সিডিশন লিখোনা, দিনকাল খারাপ!

হাসিলাম। বলিলাম, বাঙালীর শিক্ষা-সংস্কৃতির সম্বন্ধে সত্য কথা লিখবো, সিডিশন্ হবে কেন?

বড়বাবু বাহির হইয়া যাইবার সময় হাসিয়া কহিলেন, ছেলেমানুষ তুমি, সত্য কথা মানেই ত সিডিশন্!

দিন কয়েক পরের কথা বলিতেছি। কোনো বাক্‌বিতণ্ডা নাই, সকলেই কাজ লইয়া ব্যস্ত, কিন্তু মনে হইতেছিল, কোথায় যেন বারুদ জমিয়া উঠিয়াছে; একটু আগুনের ফিন্‌কি অথবা সামান্য একটু সংঘর্ষণ—অমনি সশব্দে চারিদিক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। ইহার কারণ সেই পুরাতন কথা—রাসবিহারীবাবু এখনো কাহাকেও বেতন দেন নাই; কাল দিব, পরশু দিব করিয়া প্রায় এক মাস হইয়া গেল। প্রেস বিভাগ, বিজ্ঞাপন বিভাগ, হিসাব বিভাগ, সম্পাদকমণ্ডলী—সকলেই আশায় আশায় দিন কাটাইয়া নিরাশ হইতেছে। রাসবিহারীবাবু কখন আসেন, কাহার সহিত চুপি চুপি কী কথা বলেন, এবং কখন হুস করিয়া মোটরে চড়িয়া চলিয়া যান তাহা কেহ দেখিতেও পায় না, বুঝিতেও পারে না। সকলে প্রায় তিন মাস

ধরিয়া বেতন পায় নাই। ইহা নূতন নহে, এমনি করিয়াই পাঁচ বৎসর চলিতেছে।

কিন্তু বারুদে আগুন লাগিল না, সংঘর্ষও হল না, অকস্মাৎ নীচের তলা হইতে সংবাদ প্রচারিত হইল, প্রেসের লোকেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে, তাহারা দল পাকাইয়া গেটের ভিতরে ও বাহিরে দাঁড়াইয়া হুমকি দেখাইতেছে। কাজ ত' আর তাহারা করিবেই না। বরং অশান্তি ঘটাইবে।

দৈনিক কাগজে প্রেসের লোকেরা ধর্ম্মঘট করিলে বিশেষ বিপদ, কোনো মুহূর্ত্তেই কাজ বন্ধ থাকিলে চলে না। ষোলটি পৃষ্ঠা ভরানো চাই। তৎক্ষণাৎ ডিরেক্টরগণের নিকটে টেলিফোনে খবর গেল, তাঁহারা টেলিফোন যোগেই উপদেশ পাঠাইতে লাগিলেন। রাসবিহারীবাবুকে অনেক অনুরোধ করা হইল, তিনিও উপদেশ পাঠাইলেন, কিন্তু এই ছাপাখানার ভূতপ্রেতের দলের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইতে সাহস করিলেন না। কি জানি, অভাবের তাড়নায় উহারা সব করিতে পারে! তিনি জানালেন, নিকটেই পুলিশের থানা আছে, তবে আশা করি, প্রয়োজন হইবে না।

আজ আমার উপর ভার পড়িয়াছিল, প্রাচীন ভারতের সভ্যতার সম্বন্ধে একটি আর্টিকেল্ লিখিবার জন্য। তখন মানুষে মানুষে হানাহানি হইত না, ধর্ম্মের জয় হইত, বনের ফলমূল খাইয়া মানুষ আনন্দে থাকিত। মুনি-ঋষিরা অরণ্যে বসিয়া তপস্যা করিতেন, তাঁহাদের আদর্শ ছিল মানব-সমাজের বৃহৎ ঐক্য, বৃহত্তর সামঞ্জস্য। তখন ছিল মহৎ জ্ঞান, মানুষ দৈবভাবে অনুপ্রাণিত। আমি কাগজ টানিয়া লিখিবার আয়োজন করিতেছিলাম।

এমন সময় সম্পাদক দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিলেন, তাঁহার পিছনে পিছনে রাসবিহারীবাবু ও নিবারণ। উত্তেজিত হইয়া সম্পাদক কহিলেন, মিথ্যে অনুরোধ অন্যায় অনুরোধ মিঃ মুখার্জ্জি, ওরা দরিদ্র ওরা হতভাগ্য···ওদের অন্নে হাত দেব আমি, এ পাপ, এ লজ্জা,—

রাসবিহারীবাবু কহিলেন, অনুরোধ রাখো ধনঞ্জয়, তুমি একটা দস্তখৎ দিলেই ওরা শুনবে, ওরা তোমাকে ভালোবাসে!

ভালোবাসে, তাই করব এত বড় অনাচার? ওদের মাইনে কমাবো, ওরা খাবে কি, ওরা পরবে কি? আপনি কেমন ক'রে জানবেন রাসবিহারীবাবু, দরিদ্রের ঘরের নিত্য অনটন?

মুখার্জ্জি কহিলেন, আবার ওদের মাইনে বাড়িয়ে দেবো ধনঞ্জয়, এই বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হ'তে দাও। ওরা তোমার কথা শুনবে, তুমি ওদের বিশেষ প্রিয়—এই অনুরোধটা রাখো—আজ প্রত্যেককেই দু'মাসের মাইনে দেবো, কিন্তু ওই—প্রতি কুড়ি টাকায় পাঁচ টাকা কম—এই সামান্য স্বার্থত্যাগটুকু—

নিবারণ কহিল, ওরা কমাতে রাজি রয়েছে, তবে আপনার আপত্তি কি, বড়বাবু?

সম্পাদক সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, কে বললে ওরা কমাতে রাজি?

আমি জানি। আপনার জন্যেই ত বাধা, আপনি একটা সই দিলেই আমরা অফিসসুদ্ধ সবাই সই করব।

সত্যি বলছ, নিবারণ?

উৎসাহিত হইয়া নিবারণ কহিল, কাগজখানায় আপনি আগে সই ক'রে দিন, তারপর দেখুন আমি সকলেরই সই আনতে পারি কিনা।

ধনঞ্জয় শান্ত হইয়া একবার সকলের মুখের দিকে তাকাইলেন। তারপর কহিলেন, ও, তাই নাকি? দিন্ কাগজ রাসবিহারীবাবু। বলিয়া কাগজখানা লইয়া তিনি স্পষ্টাক্ষরে নিজের নাম দস্তখত করিয়া দিলেন। সেখানা লইয়া নিবারণ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। মনে হইল, ভিতরে ভিতরে কোথায় একটা গভীর ষড়যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া আছে।

পনেরো মিনিট কাল আমরা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম; তারপর নিবারণ হাসিমুখে ফিরিয়া আসিল। বিজয়োল্লাসে সে কাগজখানা রাসবিহারীবাবুর হাতে দিল,—এখনই টাকা পাইবে বলিয়া প্রত্যেকেই মাহিনা কমাইবার সম্মতি দিয়াছে, কেহ বাদ নাই! সম্পাদক পাথরের মত নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। রাস-বিহারীবাবু কটাক্ষে ধনঞ্জয়ের দিকে তাকাইলেন, তারপর আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, ওঁর সই নিলে না যে নিবারণ?

আমি ঘাড় হেঁট করিলাম। নিবারণ কহিল, ওঁর সই দরকার নেই, উনি নতুন কাজ শিখতে এসেছেন, এখনো বড় খাতায় ওঁর নাম ওঠেনি।

রাসবিহারীবাবু পকেট হইতে চেক্-বই বাহির করিয়া কোন্ এক ব্যাঙ্কের নামে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার একখানা চেক্ কাটিলেন; সম্পাদকের দস্তখৎ পাইয়া তাঁহার আজ প্রায় আড়াই হাজার টাকা বাঁচিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, ম্যানেজারের কাছ থেকে এখুনি তোমরা টাকা পাবে ধনঞ্জয়। টাকা পেলেই ওরা ধর্ম্মঘট ভাঙবে। প্রেস যেন বন্ধ হয় না। নিবারণ, রাত্রে তুমি একবার আমার কাছে যেয়ো।

যে আজ্ঞে।—বলিয়া নিবারণ পুনরায় তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

রাসবিহারীবাবু চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে ধনঞ্জয় মাথা তুলিলেন। তাঁহার দুই চোখ ভারাক্রান্ত হইয়া আসিতেছে। কহিলেন, দাদু, নিজের মাইনে কমাইনি কেন জানো? ওরাই একদিন যাবে আমার কাছে ধার চাইতে, হাত পেতে ভিক্ষে করবে দু'টাকা, একটাকা, চার আনা,—হায়রে দুর্ভাগার দল, হায়রে অধঃপতিত জাত!

আমরা সবাই চুপ করিয়াছিলাম, কিন্তু বড়বাবু বলিতে লাগিলেন, ওদের জন্যে ওকালতি করতে গেলুম, ওরাই সই দিয়ে আমাকে লজ্জা দিলে! দাদু, এমন কেন হয় জানো? অশিক্ষা নয়, পরাধীনতা নয়, দারিদ্র্য নয়, কিন্তু ওরা জানে পৃথিবীতে দুর্ব্বলের সহায় কেউ নেই, ওরা জানে শক্তিমান্ ধনিকের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো বীর্য্য ওদের নেই! তাইত বলি, ম'রে যাক্, ঘুচে যাক্, মুছে যাক্!

বলিতে বলিতে তাঁহার গলা ভারি হইয়া আসিল, পুনরায় কহিলেন, আজ আমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে গেল। এর পরে রইল জর্ণালিজ্‌ম্ নিয়ে গণিকাবৃত্তি! অর্থাৎ সংবাদপত্র সেবার মানে, বারো আনা মোসাহেবী, দু'আনা গোয়েন্দাগিরি, বাকি দু'আনা চুকলি-কাটা! কিন্তু তবু আজ চাকরি ছাড়বার সময়ে তোমাকে ব'লে দিয়ে গেলুম, এরা একদিন দাঁড়িয়ে উঠ্‌বে, একদিন আনবে প্রচণ্ড বিপ্লব; এদের সকলের উন্মত্ত অসন্তোষ ঝড় তুলবে ওদের প্রাসাদে-প্রাসাদে, কঙ্কালসার নিরন্ন দুর্ব্বলের বুকের আগুন্ চল্‌তি সমাজকে ছারখার ক'রে দেবে!

প্রকৃতি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

দশ বছর পরে দেশে ফেরাটা সাধারণতঃ যথেষ্ট উত্তেজনার ব্যাপার। তবে সকলের পক্ষে নয়। সংসারে এমন অনেক মানুষ থাকে, জীবন যাহাদের এমন শিক্ষাই দেয় যে প্রত্যাশা করিতে তারা ভুলিয়া যায়। দেশ-বিদেশ, আপন-পরের পার্থক্য ঘুচিয়া যায়। যেখানে বাস করে তাই হয় তাহাদের দেশ, কারণে অকারণে যাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, তারাই হয় আত্মীয় বন্ধু।

হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া দাঁড়ানোর সময় বিশেষভাবে বিচলিত হওয়াই অমৃতের পক্ষে উচিত ছিল। সর্ব্বস্ব হারাইয়া একদিন যে-দেশ সে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, আজ আবার সেই সর্ব্বস্বের তিনগুণ সঞ্চয় লইয়া দেশে ফিরিয়াছে। কত বিচিত্র অনুভূতি জাগিতে পারিত অমৃতের, কত বিভিন্ন ভাবাবেগে সে উদ্বেল হইয়া উঠিতে পারিত। সে সব কিছুই হইল না। শুধু এই কথাটা তার মনে পড়িয়া গেল যে একদিন এই ষ্টেশনেই থার্ডক্লাসে উঠিয়া সে দেশত্যাগ করিয়াছিল, আজ এইখানে নামিতেছে ফার্ষ্টক্লাস হইতে। বিশেষ করিয়া এই কথাটা কেন মনে পড়িল কে জানে! হঠাৎ পথের ভিখারী হইয়া দেশ ছাড়িবার চেয়ে থার্ডক্লাসে উঠিয়া দেশ ছাড়াটাই কি তার কাছে বড় দুর্ভাগ্য হইয়া উঠিয়াছিল? ইংরাজ সহযাত্রীটির নিকট বিদায় লইবার সময় আজ যেন সেদিনকার সেই

বোম্বাই কামরায় অপরিচ্ছন্ন ঘর্মাক্ত মানুষগুলির মধ্যে বসিয়া থাকিতে তার যে অসহ্য কষ্ট হইয়াছিল এটুকু ছাড়া স্মরণ করিবার আর কিছুই সে খুঁজিয়া পাইতেছে না।

গরীব হইয়া সে ছিল প্রায় বছর তিনেক। এই তিন বছরের ইতিহাস স্মরণ করিতে গেলে এই ধরণের স্মৃতিগুলিই যেন সবচেয়ে স্পষ্টভাবে মনে পড়ে—কবে কোথায় নোংরা মানুষের ঘনিষ্ট সম্পর্কে তার অসহ্য কষ্ট হইয়াছিল। মনের মধ্যে যে একটা বিস্ময়কর রহস্যের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। একি আশ্চর্য্য প্রকৃতি তার যে, দারিদ্র্যের চেয়ে দরিদ্রকে সহ্য করিতে তার কষ্ট হইয়াছিল বেশী?

অধিকাংশ মালপত্র এবং গাড়ীটা অমৃত আগেই কলিকাতায় চালান করিয়া দিয়াছিল। সোফার গাড়ী আনিয়াছে। গাড়ীতে উঠিয়া সহরতলীতে সদ্যক্রীত নিজের পুরাতন বাড়ীটার দিকে চলিতে চলিতে এই কথাটাই অমৃত ভাবিতে লাগিল। টাকার অভিশাপ তার অজানা নয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা যাদের আছে তাদের সে মনে প্রাণে ঘৃণা করে। প্রয়োজনের উপযুক্ত টাকা যাদের নাই তাদেরও তো সে সহিতে পারে না!

তবে ওদের জন্য একটা অনাবিল শ্রদ্ধা সে আজ দশ বছর মনের মধ্যে পোষণ করিয়া রাখিয়াছে—বিশেষ করিয়া তার দেশের গরীব মধ্যবিত্ত মানুষগুলির জন্য। টাকার জন্য আজীবন ওরা লালায়িত থাকে, টাকার কাছে মাথা নীচু করিয়া জীবনের অনেক কিছু মহার্ঘ ওরা বিসর্জ্জন দেয়, তবু টাকাকেই ওরা মানুষের একমাত্র মূল্য বলিয়া ধরিয়া রাখে না—মনুষ্যত্বের অন্য মর্য্যাদাও বোঝে। নিজের জীবনে অমৃত এ জ্ঞান আহরণ করিয়াছে। এর কটু স্বাদ আজও সে ভুলিতে পারে নাই। টাকার সঙ্গে কত সহজে যে

টাকাওয়ালা বন্ধুদের হারাইয়াছিল। সুসময়ের বন্ধুদের সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদবাক্যটা জানে সকলেই, কিন্তু নিজের জীবনে সেটা ঘটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সে জানার অনেক পার্থক্য। ধনী সমাজটার প্রতি চিরস্থায়ী বিদ্বেষে অমৃতের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বিদেশে এই বিদ্বেষের তীব্রতা কম ছিল। ভাষা ও সামাজিক রীতিনীতির পার্থক্য যেন বিদেশী ধনীদের পক্ষে একটু ওকালতি করিত, মনে হইত ওরা ঠিক তার দেশের সেই টাকাওয়ালা মানুষ-গুলির মত নয়, যাদের কাছে মানুষের খাতির শুধু ব্যাঙ্কের টাকার অঙ্কটার অনুপাতে। রাখাল হালদার, যার টেনিশ কোর্টে যার ছেলেমেয়ের সঙ্গে টেনিশ খেলিয়া তার কম পক্ষে সাত জোড়া জুতা ক্ষয় পাইয়াছে, অথচ শেষবার যার বাড়ী গিয়া একেবারে বাহিরতম বসিবার ঘরটি পার হইবার অনুমতি সে পায় নাই, তার সঙ্গে বিদেশের নানা জাতি ও ধর্ম্মের পরিচিত ধনী লোকগুলির একজনেরও সাদৃশ্য সে খুঁজিয়া পাইত না। ওদের সঙ্গে তাই সে মিশিতে পারিত, তার জ্বালাভারা বিদ্বেষ তাকে দূরে সরাইয়া রাখিত না। দু'একজন অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী সেখানে যারা ছিল, শুধু তাদের সঙ্গেই ছিল তার বিরোধ। একটা ঠাণ্ডা উপেক্ষাপূর্ণ ভদ্রতা দিয়া এদের সে ঠেকাইয়া রাখিত, একটুও ঘনিষ্ঠতার সুযোগ দিত না। ওরা বাঙ্গালী বলিয়া নয়, ওদের টাকা ছিল বলিয়া।

ভাগ্যের বিপরীত বায়ুপ্রবাহে মনের আবেগ প্রায় শীতল হইয়া আসিলেও বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর জন্য একটা প্রশান্ত সহজ মমতা অমৃতের ছিল। দেশে আসিলেই যে জীবনটা তাহার আনন্দ ও সার্থকতায় ভরিয়া উঠিবে এ আশা অমৃতের এতটুকু নাই, তবু বাকী জীবনটা দেশে কাটানোই সে স্থির করিয়াছে। বাংলার জল বায়ু

আর বাঙ্গালীর সাহচর্য্য—মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর। একটা ক্ষীণ ভীরু সঙ্কল্পও অমৃতের মনে আছে, কোন এক বাড়ীর গৃহস্থের সংসার হইতে শান্ত সেবাপরায়ণা শাদাসিদে একটি মেয়েকে হয়ত একদিন সে ঘরে আনিবে।

নিজের এই বাড়ীখানা অমৃত একদিন বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল, ফিরিয়া আবার কিনিতে তাহাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই, টাকাও দিতে হইয়াছে অনেক বেশী। তা হোক, এ বাড়ীর গেট হইতে তার নাম লেখা পিতলের পাতখানা একদিন খসিয়া পড়িয়াছিল, আজ আবার তেমনি একখানা পিতলের ফলক সেখানে আঁটিয়া দিতে পারার মধ্যে যে গর্ব্ব ও আনন্দ আছে তার জন্য কোন মূল্য দিতেই সে কুণ্ঠিত হইত না। তার পুরানো আসবাবপত্রও অনেক রহিয়া গিয়াছে। সমস্ত বাড়ী ঘুরিয়া দেখিয়া অমৃত অত্যন্ত আরাম বোধ করিল। মনে হইল এমনিভাবে আবার এ বাড়ীটা দখল করিবার জন্য দশ বছর ধরিয়া তার ভিতরে যে কতবড় জোরালো আকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া ছিল, এতকাল সে তাহা ধরিতে পারে নাই। পুরানো দিনের পুরানো প্রথায় বাঁচিবার সাধ সে ত্যাগ করিয়াছে, তবু একি আশ্চর্য্য যে শুধু তার পুরানো বাড়ী আর পুরানো আসবাবগুলি তাকে এতখানি খুসী করিয়া তুলিতে পারিয়াছে! এমনি হইবে হয় ত। এখানে বাস করিবার সময় যে মানুষগুলির সঙ্গে তার ভাণ-করা প্রীতির সম্পর্ক ছিল, ঘৃণা সে করে তাদের। এখানকার জড় পদার্থের নীরব অভ্যর্থনাকে সে সাগ্রহে গ্রহণ করিবে না কেন? এই গৃহ ও আসবাবের বিরহে সে কি একদিন কম কাতর হইয়াছিল!

দোতলায় সামনের দিকের প্রশস্ত বারান্দায় দাঁড়াইয়া অমৃত চারিদিকে তাকায়, কয়েকটা নতুন বাড়ী উঠিয়াছে আশে-পাশে, গিরিনবাবুর প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ীটাকে প্রায় আড়াল করিয়া কে যেন আরও বড় আরও উঁচু একটা বাড়ী তুলিয়াছে। গিরিনবাবু! অমৃতের প্রতি কত গভীর স্নেহ ছিল বলিয়া তিনি তার এগার হাজার টাকার গাড়ীটা একেবারে হাতে-হাতে নগদ পাঁচ হাজার দিয়া কিনিয়া লইয়াছিলেন! যে রকম সাবধানী সতর্ক মানুষ গিরিনবাবু, দু'তিন হাজার লাভ রাখিয়া বেচিতে না পারিয়া থাকিলে হয়ত আজও সেই গাড়ীতে তিনি চাপিয়া বেড়ান! রাস্তার মোড়ে রামলালের পানের দোকানটা এখনো আছে, রামলাল একদিন ছিল অমৃতের বেয়ারা। দীনবেশে পায়ে হাঁটিয়া চোরের মত অমৃত যেদিন শেষবার এখানে আসিয়াছিল, রামলাল ঝুঁকিয়া তাকে সেলাম করিয়াছিল। সম্মুখ দিয়া যাওয়ার সময় মোটর থামাইয়া ওর সঙ্গে অমৃত কিছুক্ষণ কথা বলিবে। ওর সেই অযাচিত সেলামটি তো ভুলিবার নয়!

কার কার বাড়ী গিয়া দেখা করিয়া আসিবে, অমৃত তা অনেক আগেই ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল, পরদিন সকালে সে বাহির হইয়া পড়িল। প্রথমেই গেল আলিপুরের উকীল প্রমথবাবুর বাড়ী। অমৃতের শেষ মামলাটা প্রমথবাবুই বিনা 'ফি'তে করিয়া দিয়াছিলেন, তারপর অসুস্থ অমৃতকে ছ'মাস বাড়ীতে রাখিয়া করিয়াছিলেন চিকিৎসা। প্রমথবাবুর পশার তেমন ভাল ছিল না, কোনমতে সংসার চালাইতেন। অমৃত তাকে অনেকবার নানা উপলক্ষে টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে প্রমথবাবুর টাকা চাহিবার গ্লানতায় এবং টাকা পাইয়া উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা জানাইয়া চিঠি

লিখিবার কায়দায় অমৃতের মনে আঘাত লাগিয়াছে বটে, কিন্তু সে আঘাত সে জোর করিয়া ভুলিয়া গিয়াছে। নিজেকে এই বলিয়া বুঝাইয়াছে যে হয় ত ওদের চিঠি লিখিবার প্রথাই এইরকম।

পথচারীদের দুদিকের বাড়ীর গায়ে ঠেলিয়া দিয়া সঙ্কীর্ণ গলিতে সন্তর্পণে গাড়ী প্রমথবাবুর বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। প্রমথবাবু নিজে বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া অমৃতকে বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে তাঁর বড় ছেলে অবিনাশ বাংলা কাগজ পড়িতেছিল, অমৃতকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই যে দাঁড়াইল, মনে হইল আর সে বসিবে না। বয়সে সে অমৃতের সমবয়সীই হইবে, অমৃত যখন এ বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল সাত দিনের মধ্যে ওর সঙ্গে তার নিবিড় অন্তরঙ্গতা জন্মিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তারপর দশ বছর কাটিয়া গিয়াছে এবং আজ তো অমৃত আশ্রয়-ভিখারী হইয়া আসে নাই। আজ অমৃতের সঙ্গে বন্ধুর মত কথা বলা ওর পক্ষে বড় কঠিন।

প্রমথবাবুর সমস্ত চুল ধবধবে সাদা হইয়া গিয়াছে, দশ বছরে তিনি এত বুড়া হইয়া পড়িবেন প্রমথ তা ভাবিতেও পারে নাই। সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমের পীড়নে ওদের অস্বস্তি দেখিয়া অমৃত নিজেই কথা আরম্ভ করিল, সকলের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করিল। কিছুক্ষণ পরে আলাপ আলোচনা অনেকটা সহজ হইয়া আসিল বটে কিন্তু একেবারে স্বাভাবিক হইতে পারিল না। তখন সহসা অমৃতের মনে পড়িল, সেবারও এমনি হইয়াছিল, সে যখন এ বাড়ীতে আশ্রয় লইতে আসিয়াছিল। কথা বলিতে গিয়া সে যেমন সব সময় সতর্ক হইয়া থাকিত কি বলা উচিত আর কি বলা উচিত নয়, তেমনি সাবধানতা আজ ওদের মুখের কথাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

ক্ষণকালের জন্য অমৃতের মুখে একটা বিপন্নভাব ফুটিয়া উঠিল। হাতে মুখে ও উঁচু পেটে ভাত-মাখা অবস্থায় বছর চারেকের একটা উলঙ্গ ছেলে হঠাৎ ঘরে ঢুকিবামাত্র শাঁখাপরা দুটি শীর্ণ হাত তাহাকে ছিনাইয়া ভিতরে লইয়া গেল। ঘরের মেঝেটা সেঁতসেঁতে—একটা সোঁদা গন্ধ অমৃতের নাকে লাগিতেছিল। সে আসিবে বলিয়া যে বাড়ী ঘর একটু সাফ করিবার চেষ্টা হইয়াছে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়—তবু চারিদিক অপরিছন্ন, নোংরা। শুধু ঝুল পরিষ্কার করিয়া কে বিবর্ণ দেয়ালে শুভ্রতা আনিতে পারে? ঝাঁটাইয়া সাফ করিতে পারে মেঝের গর্ত? কেমন একটা দুর্ব্বোধ্য কষ্ট হইতে থাকে অমৃতের, ছোট সাইজের পোষাকের মত কি একটা কঠিন আবরণ যেন তাকে শক্ত করিয়া চাপিয়া রাখে। তাঁর রুমালের মৃদু দামী গন্ধটা যেন হঠাৎ উগ্র হইয়া তাঁকে ঘিরিয়া জড়ো হইতে থাকে, এখানকার অপরিচিত ও অস্বস্তিকর গন্ধকে আমল দিবে না। নিজের বসিবার ভঙ্গীতে সহসা সে আবিষ্কার করে একটা আয়েস-শূন্য সন্তর্পণ সাবধানতা,—চেয়ারের হাতায় হাত রাখিতে, কালো তৈলাক্ত পিঠটায় ঠেস দিতে প্রথম হইতে সে সঙ্কুচিত হইয়া আছে। এমন করিলে তো চলিবে না! এখানে সে আপন-জনকে খুঁজিতে আসিয়াছে, সর্ব্বদা আসিবে যাইবে, প্রাণ খুলিয়া মেলামেশা করিবে তার নিঃসঙ্গ জীবনে এ বাড়ীর মানুষগুলি হইবে সঙ্গী। এমন কাঠ হইয়া ওদের কাঠের চেয়ারে বসিয়া থাকিলে ওদের সে আপন করিতে পারিবে কেন?

প্রতিমুহূর্ত্তে অমৃত অন্দরে যাওয়ার আহ্বান প্রত্যাশা করিতেছিল কিন্তু কেউ ডাকিল না। বার দুই ভিতরে আসা যাওয়া করিয়া অবিনাশ এক রেকাবি খাবার ও এক গ্লাস জল লইয়া আসিল,

তারপর আনিল চা। এখানে খাইতে হইবে জানিয়া অমৃত কিছু খাইয়া আসে নাই, ক্ষুধা পাইয়াছিল। সামনে খাবার দেখিয়া জাগিয়া ওঠার বদলে সে ক্ষুধা যেন ঘুমাইয়া মরিয়া গেল। এঁটো বাসন ছড়ান শ্যাওলাধরা কলতলায় ছাই দিয়া মাজিয়া ময়লা ন্যাকড়া বুলাইয়া রেকাবি গ্লাস ধোয়া হইয়াছে, চায়ের কাপটার বাঁকানো হাতলটার খাঁজে লাগিয়া আছে বাদামী রঙের একটু শুকনো সর। চা যে তৈরী করিয়াছে, কে জানে কোলে তার ছোট ছেলে ছিল কি না, যার মুখ দিয়া লাল ঝরে আর নাক দিয়া জল ?

মৃদু একটু হাসিয়া অমৃত বলিল, 'আমি তো কিছু খাব না কাকা। খেয়ে বেরিয়েছি।' মুখের কুঁচকানো চামড়া আরও কুঁচকাইয়া প্রমথও সবিনয়ে হাসিয়া বলিলেন, 'তোমার উপযুক্ত আদর যত্ন করি সে ক্ষমতা তো নেই বাবা, সামান্য কিছু মুখে দাও ?'

অবিনাশ বলিল, 'মিষ্টিফিষ্টি খেতে বোধ হয় ভালবাসেন না আপনি, বরং কেকটা খান, ভাল কেক।'

অর্দ্ধেকটা মন প্রতিবাদ করিতেছিল,—'এ চলিবে না, দশ বছর ধরিয়া সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছ, এ বাড়ীতে ঢুকিয়া ঘরের ছেলের মত চাহিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া খাবার খাইবে, সেই আশায় সকালে চা পর্য্যন্ত পান কর নাই : এ সব তোমাকে খাইতেই হইবে।' কিন্তু খাবারগুলি মুখে করার কথা ভাবিতেও গা যেন অমৃতের ঘিন ঘিন করিয়া উঠিতেছিল। তার বাবুর্চ্চিখানায় এক কণা ধূলি জমিতে পায় না, তার বাবুর্চ্চিরা ধব্‌ধবে উর্দ্দি পরে, তার খাদ্য কারো হাতের স্পর্শ পায় না, তার থালা, বাটি, কাপ, ডিস, সাবান সোডা গরম জলে ধোয়া হয়। ময়রার দোকানের ঐ সব খাবার, রুটির দোকানের এ

কেক সে মুখে তুলিবে কি করিয়া? সাত দিনের বাসি সর-লাগানো চায়ের কাপে কেমন করিয়া চুমুক দিবে?

এবার অমৃতের হাসিটা ক্লিষ্ট দেখায়। বলে, 'খাবার জন্য ভাবছেন কাকা? কত আসব কত খাব, আজ খিদে নেই, নাইবা খেলাম? শরীরটা আমার তেমন ভাল নয়। একটু খাওয়ার অনিয়ম হলে অসুখ করে।'

প্রমথ কাতর ভাবে বলিলেন, 'চা-টা খাও?'

'চা? চা তো আমি খাই না।'

চাও সে খাইবে না অমৃত এই কথা বলিতে যাইতেছিল, তার বদলে এতবড় মিথ্যাটা সে যে কেন বলিয়া ফেলিল! সব কেমন ওলোট পালোট হইয়া যাইতেছে, দশ বছরের পোষণ করা সঙ্কল্পগুলি হইয়া উঠিতেছে অর্থহীন। তবু, প্রিয় কল্পনাগুলির এই শোচনীয় পরিণতির জন্য মনে যে বিষাদ আসিয়াছে, অম্লানবদনে একটা মিথ্যা কথা বলিয়া যতখানি অনুতাপ জাগিয়াছে, তার মধ্যেও যদি সে ভুলিতে পারিত অবিনাশের গলার খাঁজে মাটির রেখাটি দেখিতে পাওয়ার বিতৃষ্ণা! যাকে সে নিজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু করিবে ভাবিয়াছিল গলায় তার সূক্ষ্ম একটি মাটির রেখা থাকিলে কি আসিয়া যায়? সাবানে ধোয়া সযত্নে মাজা-ঘষা মানুষ তো সে চায় না, চায় সরল মনের অকৃত্রিম প্রীতি, যে মনে টাকা বিছানো নাই। তা ছাড়া এতো জানা কথাই যে বেশী টাকা যার নাই, জীবিকা অর্জ্জনের কঠোর তপস্যায় সকল সময় সে গলার খাঁজের ময়লা তুলিবার সময় পায় না। এ সব যদি সে বরদাস্ত করিতে না পারে, গরীব মধ্যবিত্তদের মধ্যে নিজের সামাজিক জীবনটি সে গড়িয়া তুলিতে পারিবে কেন?

হঠাৎ অতিমাত্রায় আগ্রহ দেখাইয়া অমৃত বলিল, 'চলুন,' কাকীমার সঙ্গে দেখা করে আসি।' বলিয়াই অন্দরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া অমৃত উঠিয়া দাঁড়াইল। বোঝা গেল তার এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে পিতাপুত্র একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। কিছু না বলিয়া অবিনাশ ভিতরে চলিয়া গেল। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'চলুন।'

অবিনাশের মা তাড়াতাড়ি মটকার শাড়ীখানা পরিয়া ফেলিতে-ছিলেন, অমৃত যখন গিয়া প্রণাম করিল তখনও শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কি আশীর্ব্বাদ করিলেন অথবা একেবারে করিলেন কি না বোঝা গেল না। পাটি বিছাইয়া আগন্তুককে বসিতে দিবেন। কপালের সীমানায় কাঁচা পাকা চুলের প্রান্তে ছোট আবৃটি পর্য্যন্ত ঘোমটা কমাইয়া বলিলেন, 'ভাল আছ বাবা?'

অমৃত সহজভাবে বলিল, 'ভালই আছি কাকিমা। আর সকলে গেল কোথায়?'

'সুনীতির কথা বলছো? সে বোধ হয় রান্না ঘরে।'

অমৃত বলিল, 'ডাকুন না, দেখি কেমন বড়-সড় হয়েছে।'

সুনীতি আসিল, ভাতমাখা উলঙ্গ ছেলেটাকে বাহিরের ঘর হইতে যে দুখানা শাঁখা-পরা হাত ছিনাইয়া আনিয়াছিল, সেই দু'হাতে আধ ময়লা শাড়ীর আঁচল ধরিয়া। এর বিবাহে অমৃত দুবারে প্রায় পাঁচ শ' টাকা পাঠাইয়াছিল। টাকাটা সার্থক হইয়াছে কি না সুনীতিকে দেখিয়া তা অনুমান করা গেল না। মনে মনে হিসাব করিয়া অমৃত দেখিল, তের আর দশে সুনীতির তেইশ বছর বয়স হইয়াছে। বয়সটা পূর্ণ যৌবনের যার ভাঙা একটা অংশও সুনীতির নাই।

এদিকে, আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রমথ ও অবিনাশের কি যেন পরামর্শ চলিতেছিল, খানিক পরে একটি আধাবয়সী বৌ, একটি বছর পনের বয়সের মেয়ে এবং একটি সুনীতির সমবয়সী বিধবা মেয়ে একে একে ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, আর আসিল গুটিকতক ছোট বড় ছেলে মেয়ে। কারো মুখে ভয়ের ছাপ, কারো চোখ দুটি কৌতুহলী। কিন্তু মুখে কারো কথা নাই। অমৃতের আবির্ভাবে এ বাড়ীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থমকিয়া থামিয়া গিয়াছে।

অমৃত বুঝিতে পারিল, বাড়ীর মেয়েদের তার সামনে বাহির করিবার সঙ্কোচটা বাড়ীর কর্ত্তা দু'জন এতক্ষণে কাটাইয়া উঠিয়াছেন।

সুনীতির ছোটবোন সুমতিকে দেখিয়া অমৃতর মানসিক বিপর্য্যয় বাড়িয়া গেল সবচেয়ে বেশী। অনেক বয়স হইয়াছে সুমতির, এবার বিবাহ না দিলেই নয়, ইতিপূর্ব্বে চিঠিতে অমৃতকে এই কথাটা প্রথম আভাসে ইঙ্গিতে জানাইয়া রাখিয়াছিলেন। সাহায্য চাহিবার সেটা ভূমিকা। মধ্যবিত্ত সংসারের শাদাসিদে একটি মেয়েকে ঘরে আনিবার যে মৃদু কামনা অমৃতের মনে আসিয়াছিল, তারি প্রেরণায় সে কি সুমতিকে নিজের চোখে দেখিবার জন্য একটু বিশেষভাবে উৎসুক হইয়াছিল? দেখিতে সুমতি মন্দ নয়, পরনে একখানা আধময়লা শাড়ী থাকিলেও এই বয়সের স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতার অভাব যে তার নাই তা বোঝা যায়, সলাজ নম্র ভাবটিও তার মনোরম, তবু যেন অমৃত মনে মনে ভয়ানক নিরাশ হইয়া গেল। কেমন করিয়া সে যেন বুঝিতে পারিল, সুমতির আগাগোড়া সবটাই ফাঁকি, এ তার চোখ-ভুলানো অস্থায়ী অভিনয়ের মূর্ত্তি, কোন মতে যাহাতে কারো বৌ হইতে পারে কিছুদিনের জন্য তাই সে এসবস ংগ্রহ করিয়াছে—ওর আসল চেহারা অবিকল সুনীতির মত, দেহ এবং মনের

কপালে সিঁদুর উঠিলে দেখিতে দেখিতে ওর লাবণ্য ঝরিয়া যাইবে, নম্রতা হইবে তোষামোদ, স্নেহ হইবে পাগলামী, কিশোর বয়সের ভাবপ্রবণ সারল্য ঘুচিয়া গিয়া দেখা দিবে স্বার্থরক্ষার নিখুঁত কুটিলতা! এই বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টি যেন আলোর মত অমৃতের মনে ফুটিয়া উঠে, সুমতিকে যাচাই করিতে আসিয়া সে পরীক্ষা করে সুনীতিকে। আধঘণ্টা আগে কুণ্ঠিত পদে ঘরে ঢুকিয়াছিল সুনীতি, আধঘণ্টার মধ্যে তার বুকে মমতার বান ডাকিয়াছে। শুধু তাই ডাকিয়া যদি ক্ষান্ত থাকিত, চোখবোজা অন্ধের মত অমৃত নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিত, কিছু দেখিত না, কিছু বুঝিতে চাহিত না।

শুধু তা তো নয়।

অমৃতের লম্বা পাঞ্জাবীর তলার পকেট হইতে মাণিব্যাগটা পাটির উপর পড়িয়া গিয়াছিল, সুনীতির আঁচলের তলে সেটা চাপা পড়িয়াছে। মুখখানা পাংশু সুনীতির, কথা ও হাসি যেন হিষ্টিরিয়া! সুনীতির স্বামীর চাকরী নাই? না থাক, সে নিজে এবং তার স্বামীপুত্র কোনোদিন অনাহারে মরিবে না।

সুনীতিই যে সুমতির একমাত্র অবশ্যম্ভাবী পরিণতি শুধু এই বিশ্বাসটি আঁকড়াইয়া থাকিবার মত নির্ব্বোধ অমৃত নয়। একথা কোনমতেই ভোলা চলে না যে, অনেককাল সুনীতির স্বামীর চাকরী নাই। এবং সে যদি সুমতিকে বিবাহ করে এমন দিন হয় তো কখনো আসিবে না, সুমতির মুখের একটা অনুরোধ যখন সুনীতির স্বামীর মতো দু'একজনকে চাকরী জোগাইয়া কৃতার্থ করিতে পারিবে না। সে সুমতিকে গ্রহণ করিলে সুমতি একদিন সুনীতি হইয়া উঠিবে এ আশঙ্কা গাড়ীতে উঠিয়া বসিবার আগেই অমৃতের মন হইতে মিলাইয়া গেল। তবে সুমতির সম্বন্ধেও আশা ভরসা

করিবার কিছু থাকিবে কি না সন্দেহ। বিপরীত কারণে সেও এক নূতন রকম শোচনীয় পরিণতি লাভ করিবে। মধ্যবিত্ত সংসারের কল্পনা-প্রবণ লাজুক কিশোরী সুনীতি অভাবে যদি এমন হইয়া থাকে, প্রাচুর্য্য সুমতিকে কি করিয়া দিবে কে জানে! দারিদ্র্য যদি সুনীতির সহ্য না হইয়া থাকে, টাকা সুমতির সহিবে কেন? টাকা না থাকার চেয়ে টাকা থাকা তো কম ভয়ঙ্কর নয়! অমৃতের চেয়ে কে তা ভাল করিয়া জানে?

অফিসের বেলা হইয়াছে। রাস্তায় গাড়ী ও ফুটপাতে মানুষের ভীড়। গাড়ী কখনো জোরে, কখনো আস্তে চলিতেছিল। গাড়ীর গতি শ্লথ হইয়া আসিলে দুপাশের জনস্রোতের মুখগুলিতে অমৃত যেন আজ শুধু ক্ষোভ ও ক্ষুধা আবিষ্কার করিতে লাগিল। আজ যেন নগ্নদেহগুলি বিশেষভাবে চোখে পড়িতেছে, একটি ভিখারীর চেহারা আড়াল করিয়া রাখিতেছে, হাজার মানুষকে। ওদের জন্য অমৃতের মনে গভীর মমতা আছে, আর আছে ওদের সান্নিধ্যের প্রতি নিবিড় ঘৃণা। হঠাৎ গাড়ী থামাইয়া দূর হইতে একটি ভিখারীকে সে একটা টাকা ছুড়িয়া দিল। আর একজনকে ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে তাড়াতাড়ি কাছে আসিতে দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্তের মত ব্যাকুলভাবে সোফারকে তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাইতে বলিল। এবং তার গাড়ীর মত প্রকাণ্ড আরেকটা গাড়ী পিছন হইতে আসিয়া ভিখারীটাকে চাপা দিলে একটু স্বস্তিই যেন সে বোধ করিল। ওই গাড়ীর সুবেশধারী স্থূলকায় আরোহীটিকে সে বিস্ময়কর তীব্রতার সঙ্গে ঘৃণা করে, কিন্তু ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে ভিখারীটি গাড়ীর দিকে আগাইয়া আসিবার সময় সে যে ভাবে শিহরিয়া উঠিয়াছিল ওর গাড়ীখানা আগাইয়া আসিয়া পাশে থামিয়া গেলে দু'হাত দূরের মধ্যে এই

মোটা ঘৃণ্য ধনীটিকে দেখিয়া অত্যন্ত মৃদুভাবেও তো তেমন শিহরণ তার জাগিল না? অর্থের অন্যায় অসমান বিতরণের পাপ যাদের দিয়া জীবনব্যাপী বীভৎস প্রায়শ্চিত্ত করায়, লাখটাকার শক্তি সঞ্চয় করিয়া তাদের মধ্যে তাদের ভালবাসিয়া তাদেরই একজন হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার উদ্দেশ্যে দশবৎসরব্যাপী তপস্যার এ কি পরিণাম! দূর হইতে ওদের মমতা করিবার মানসিক বিলাসিতাটুকু কম-বেশী কা'র না থাকে? এই বিপুলদেহ ধনীটার সঙ্গে তার তবে পার্থক্য রহিল কোথায়?

অমৃত নামিয়া গেল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া ভিখারীর নিস্পেষিত দেহটা দুহাতে বুকে তুলিয়া মোটরে শোয়াইয়া দিল। কাঁধের কাছে ভিখারীর বহুদিনের পুরাতন যে ক্ষত হইতে রক্ত চোয়াইয়া পড়িতেছিল, হাতের তালুতে সেটা চাপা দিয়া রাখিয়া সোফারকে বলিল, হাঁসপাতাল।

না, হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া অমৃতের মন আত্মপ্রসাদে হাল্কা হইয়া গেল না। সাময়িক উন্মত্ততা, যে সুনিবিড় জ্বালা আনিয়াছিল, সেটা জুড়াইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাখা জামা কাপড়ের স্পর্শে শরীরটা যেন তার কুঁকড়াইয়া যাইতে লাগিল, মনে হইতে লাগিল সে যেন খানায় পড়িয়া গিয়াছিল, ডাষ্টবিনে। জোরে গাড়ী হাঁকাইয়া সোফার তাহাকে বাড়ী লইয়া গেল। অমৃত ছুটিয়া গিয়া প্রবেশ করিল বাথরুমে।

সারাদিন দেহটা তার অশুচি মনে হইতে লাগিল, স্নায়বিক ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের মত নিজের স্নাত ও পবিত্র শরীরটার সেই আধ-ঘণ্টার অপব্যবহারকে সে যেন কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছিল

না। সন্ধ্যার পর বিষণ্ণ বিরক্ত ও হতাশ মনে সে দোতলার বসিবার ঘরে বসিয়াছিল, বেয়ারা কার্ড আনিয়া দিল রাখাল হালদারের।

মৃদু একটু হাসিল অমৃত। সে জানিত রাখাল হালদার আসিবে। সে জানে সকলেই আসিবে—আজ অথবা কাল। ওদের লজ্জা নাই, দুর্ব্বলতা নাই। হালদার ঘরে ঢুকিলে অমৃত সাগ্রহে তার দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। কতকাল নিঃসঙ্গ কাটিয়াছে। মানুষের সাহচর্য্য ছাড়া কি মানুষ বাঁচে, ঘৃণা করিয়া, ভাল না বাসিয়া? অন্ততঃ তার একটা খুব বাস্তব অভিনয় বিনা? হোক মিথ্যা, হোক ফাঁকি, মানুষের এই রকম প্রকৃতি!

ঝুনকি

বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

সাগরদীঘি যেতে হয়েছিল বিশেষ একটা কাজে। সেই কাজটার কথা না শুনলেও আপনাদের চলবে; কিন্তু আমার যাওয়াকে কেন্দ্র ক'রে যে গল্পটি সেখানে গ'ড়ে উঠেছিল—সেটুকু না শুনলে আপনাদের চলবে না। অতএব শুনুন।

উঠেছিলাম ষ্টেশনের কাছাকাছি একটা বাংলোতে। সঙ্গে ছিল একজন চাকর, রান্নার কাজটাও সেই করতো। বাংলোটা যিনি নির্ম্মাণ করেছিলেন, আর কিছু না হোক্ তাঁর স্থান নির্ব্বাচনের রুচির প্রশংসা করতেই হবে। চারিদিকে খোলা মাঠ, বারান্দায় বসে ইজি-চেয়ারে শুয়ে দেখতাম,—দূরে দক্ষিণ দিগন্তে শ্যামল গাছপালায় ঘেরা কোন একটি গ্রামের অস্তিত্বের আভাস।

সেদিন বেলা বোধ করি দশটা হবে। বারান্দায় ইজি-চেয়ার-খানা পেতে চুপ্‌চাপ শুয়ে শুয়ে আগের দিনের খবরের কাগজখানা নাড়াচাড়া করছি। শীতকাল, এদিকে বেশ শীত পড়েছে।

হঠাৎ কাণে এল—মুরগী নেবেন বাবু, মুরগী? চোখ তুলে চেয়ে দেখি একটি চাষা গোছের লোক—একটি মোটা-সোটা মুরগীকে বুকে ক'রে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে এসে এ বস্তুটীর খোঁজ করেছি, কিন্তু সুবিধে-মত পাওয়া যায়নি বলে আর চেষ্টাও করিনি। তাই মুরগীটীকে দেখবামাত্র আমার কি রকম লোভ হ'ল। সচরাচর এ রকম মুরগী বড় একটা চোখে পড়ে না।

—বললাম—নিতে পারি, কত দাম নিবি ?

—দাম ! লোকটি যেন খানিকটা হতভম্বের মত আমার দিকে চেয়ে রইল। যেন এই ধরণের কথাও এই প্রথম শুনলো। তারপর মুরগীটার দিকে আর একবার চেয়ে নিয়ে বললো—দাম তো কিছু ঠিক করিনি বাবু!

—এই মরেছে ! ব্যাটার বুদ্ধি দেখ। মুরগী বেচতে এসেছিস—দাম ঠিক করিসনি কীরে ? লোকে শুনলে হাসবে যে !

লোকটি কি-রকম সঙ্কোচের সঙ্গে উত্তর দিল—তা হাসুক বাবু, কিন্তু সত্যি বলছি—দাম আমি ওর ঠিক করতে পারবো না।

—বাজে কথা রাখ্—কি নিবি তাই বল্। ধমকে বললাম। লোকটি একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললো—যা হয় দিন।

—আট আনা দেব—দিবি ?

—তাই দিন।

পয়সা নিয়ে লোকটা মাঠ ভেঙ্গে সোজা দক্ষিণ দিকে চলতে আরম্ভ করলো। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ মাঠের দিকে চেয়ে দেখি যে লোকটি কিছুদূর গিয়ে—মুখ ফিরিয়ে আমার বাংলোর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আমার চোখে চোখ পড়তেই আবার সে হাঁটতে সুরু করলো। মনটার মধ্যে কি-রকম একটা খটকা লাগলো। লোকটার এই অদ্ভুত আচরণের মানে কী, কেনই বা ও মুরগীটিকে বুকে ক'রে নিয়ে এলো, আর কেনই বা দাম জিজ্ঞাসা করবার সময় মুখখানাকে ও-রকম করুণ ক'রে তুললো, আর কিসের জন্যেই বা এতক্ষণ ধরে আমার বাংলোর দিকে চেয়ে ছিল ? সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কেমনতর। চাকর এসে বললো—মুরগী কি এ বেলা হবে ?

বল্লাম—না ওবেলা।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে কিছুতেই বইয়ে মন দিতে পারলাম না। কি যেন একটা অকথিত গল্প আমার মনের মধ্যে ধরা দিচ্ছে না। আমার অন্তরের নেপথ্যলোকে কোথায় যেন একটা অবিরাম কান্নার আভাস পাচ্ছি। কার যেন কোথায় কি একটা প্রকাণ্ড ক্ষতি হয়েছে—তারই একটা সকরুণ বিলাপ—আমার সমস্ত চৈতন্য ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করছে।.........

স্বপ্নে দেখলাম—

করিমের অবস্থা চিরকালই কিছু এমন খারাপ ছিল না।—পূর্ব্বপুরুষদের অতীত তালিকায় যেমন অনেক দান-ধ্যানের কথা আছে, তেমনি করিমেরও সারাজীবনে অনেক সুকৃতির সাক্ষ্য আছে। এই তিন বছর আগেও তার উঠানে পাঁচটা ধান-বোঝাই মরাই, আর গোয়ালে অন্ততঃ ষোল সতেরটি গরু ছিল। ছেলেপুলে স্ত্রী আর নিজেকে নিয়ে—সংসারযাত্রাকে সে বেশ ছন্দোময় ক'রে তুলেছিল। কিন্তু বিধাতার সইল না। পর পর তিন বছর হ'ল অজন্মা। শস্য-হীন শূন্য মাঠ ভ'রে শুধু ধূলো উড়তে লাগল। মাঠের মুখ চেয়ে যাদের দিন কাটে, ভয়ে তাদের বুক উঠলো শুকিয়ে, আসন্ন দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়লো দেশের সর্ব্বত্র।............

করিমও বাদ গেল না। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একে একে গেল তার সংসারের সব কিছু। গেল বৌয়ের গায়ের গয়না, গেল গরু-বাছুর, গেল ঘটি-বাটি, গেল মান, গেল সম্ভ্রম। এর পর প্রত্যেক দিনের অন্নসংস্থান করাই হ'য়ে উঠলো শক্ত। দুঃখে, ক্ষোভে, নিরাশায় করিম একবার কটমট ক'রে আকাশের দিকে চায়, কিন্তু

আকাশ মানে তো কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়, আকাশ মানে মহাশূন্য—কোন মানুষের চোখের জলে সেখানে তো মেঘ জমে না।

দুদিন অনাহারের পর তৃতীয় দিনের রাত্রি প্রভাত হ'ল। করিম বাইরের বারান্দায় ব'সে ব'সে শুনতে লাগলো, বাড়ীর ভিতরে ক্ষুধার্ত্ত ছেলে-মেয়েদের আর্ত্ত চীৎকার! কষ্ট তার নিজেরও কিছু কম হচ্ছে না,—কিন্তু কীই বা করা যাবে? ঘরে বাসন-কোশন এমন কিছু নেই—যা বেচে অন্ততঃ আজকের দিনটার মত পেট ভরানো চলতে পারে। করিমের স্ত্রী কিছুই বলে না,—সে তো জানে স্বামীর অসহায়তার কথা; তাই শুধু ম্লান চোখে এক একবার স্বামীর মুখের দিকে তাকায়, সে দৃষ্টির মধ্যে অভিযোগ নেই, ধিক্কার নেই, আছে বোধ করি আশ্রয় প্রার্থনার একটা ব্যাকুল আবেদন।

"কি করা যায়! কি করলে আজ ওদের মুখে দুটি ভাত দিতে পারবো? দুদিন শুধু মুড়ি আর জল খেয়ে বেঁচে আছে ওরা, কিন্তু আজ তো আর ধারে মুড়িও পাওয়া যাবে না!" করিম ভাবতে লাগলো। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো শিউলি-তলায় ঠুন্‌কি নিঃশব্দে খুঁটে খুঁটে কি খাচ্ছে। ঠুন্‌কি হচ্ছে করিমের ছেলে আব্বাসের পোষা মুরগী। আব্বাসের আদর পেয়ে পেয়ে ও এখন চৌকীর উপর তাদের পাশেই শুয়ে ঘুমোয়, এক থালায় ভাত খায়। একদিন ও কোথায় পালিয়ে গিয়েছিল ব'লে আব্বাস সেদিন ভাতই খায়নি! আর আশ্চর্য্য,—মুরগীটার মানুষের মত কথা বুঝবার ক্ষমতা! ঠুন্‌কি ব'লে একবার ডাক দিলে হয়, যেখানে থাকুক ছুটে এসে হাজির হবে।

করিম অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে ঠুন্‌কির চলাফেরা লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ সে এক সময় মরিয়ার মত বারান্দা ছেড়ে উঠে গিয়ে ঠুন্‌কির

গলাটা চেপে ধ'রে, তৎক্ষণাৎ তাকে আলোয়ানের মধ্যে লুকিয়ে ফেললো। তারপর দু-একবার এদিক ওদিক চেয়ে দেখে নিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে সাগরদীঘির ষ্টেশনের দিকে দৌড়লো।

পল্লীগ্রাম। সামান্য কয়েকটা পয়সাতেই একটা পরিবারের একদিনের খোরাক চলে যায়। করিম আজ বাজার থেকে কত জিনিষ নিয়ে এসেছে, মায় পয়সা চারেকের মাছ পর্য্যন্ত। খেতে পাবে শুনে ছেলেপুলের আনন্দ আর ধরে না—সকলেরই মুখে হাসি ফুটেছে।

—বেলা তখন বারোটা কি একটা। করিমের স্ত্রী রান্না ক'রে সকলের পাতে পাতে ভাত বেড়ে দিচ্ছে, এমন সময় আব্বাস ব'লে উঠলো—মা, ঠুন্‌কি! ঠুন্‌কি কোথায় গেল?—দেখছি, তোরা খা। ব'লে করিমের স্ত্রী বাইরে গিয়ে চীৎকার ক'রে ডাকতে লাগলো,—ঠুন্‌কি! ঠুন্‌কি! আয়! ভাত খাবি আয়! অনেক ডাকাডাকির পর সাড়া না পেয়ে করিমের স্ত্রী এসে স্বামীকে বললো—ঠুন্‌কিটা কোথায় গেল গো! তুমি খেয়ে উঠে একবার দেখো—কেমন? কোথায় গেল মুরগীটা! সেও আজ দুদিন থেকে না খেয়ে আছে। এই ব'লে সে আবার বাইরে গিয়ে চেঁচাতে আরম্ভ করলো,—ঠুন্‌কি! ঠুন্‌কি!

করিম নিঃশব্দে ভাত খেয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু এটা বোধ করি একমাত্র বিধাতা ছাড়া আর কারুরই চোখে পড়লো না,—যে তার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল ঝ'রে ভাতের মধ্যে পড়ছে, আর প্রত্যেক গ্রাসের সঙ্গে নিজের চোখের জলমাখা সেই ভাতগুলি সে নীরবে—যেন জোর ক'রেই মুখের ভিতরে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে।.........

চট ক'রে ঘুমটা ভেঙ্গে যেতেই বিছানার উপর উঠে বসলাম। মনে হ'ল এ রকম একটা অদ্ভুত গল্পের সঙ্গে আমার কী সম্বন্ধ !

কী জানি কেন সকাল বেলার কেনা মুরগীটার কথা মনে হ'তেই দ্রুতপদে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সন্ধ্যে হ'য়ে আসছে। সামনের মাঠটায় ব'সে চাকরটা মুরগীটা ছাড়াচ্ছে। মাথাটা একধারে প'ড়ে আছে—পালকগুলো বাতাসে উড়ছে। আমি সেই দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে আছি দেখে চাকরটা বললে,—

বড় সস্তায় পাওয়া গেছে বাবু মুরগীটা। কী চর্ব্বি।

কল্পনায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কেন যে এত জায়গা থাকিতে সেদিন জেটির দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলাম মনে নাই। কিন্তু ভাল লাগিয়াছিল।

অন্ধকার তখনও খুব গাঢ় হয় নাই। নদীর দুইপারে পৃথিবীর কটি-মেখলার মত আলোক বিন্দুর ব্যবধান-রেখা ছাড়াও আকাশ ও জল তখন পৃথক করা যায়।

মানুষের হাতের স্পর্শ লাগিলে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যাহাদের কাছে নষ্ট হইয়া যায়—আমি তাঁহাদের দলের নই। এ নদী যন্ত্র-সভ্যতার আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইবার আগে অকলঙ্ক কৌমার্য্যের সৌন্দর্য্য লইয়া যত অপরূপই থাক, তার বর্ত্তমান রূপ আমার কাছে অবহেলার বস্তু নয়; নদীর জলের উপর বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজের সুবিশাল ছায়ামূর্ত্তি আমার ভাল লাগে। তাহার কালো জল আলোড়িত করিয়া যে অগণন ষ্টীমার ও বোট চলাফেরা করে তাহাদের ব্যস্ততায় আমার মন কেমন করিয়া সাড়া দেয়। দুই তীরের আলোকিত বড় বড় কারখানা বাড়ীগুলি রূপ-কথার রাজপুরী নয় বলিয়া আমার সৌন্দর্য্য-বোধ ক্ষুণ্ণ হয় না। প্রাচীন যুগের হাজার-দাঁড়ি মকরমুখি ডিঙ্গার বদলে যে ষ্টীমারগুলি অত্যন্ত স্থূল প্রয়োজনে নদীপথে যাতায়াত করে আমার মনের মায়ালোকে তাহাদেরও স্থান আছে।

জেটির পাটায় বসিয়া বিংশশতাব্দীর নদীর এই নব রূপ উপভোগ করিতেছিলাম, এমন সময় নদীপথযাত্রী একটি ষ্টীমারের তীব্র সার্চ্চ-লাইট চোখে আসিয়া পড়িয়া চোখ ধাঁধাইয়া দিল। চমকাইয়া পিছন ফিরিতেই দেখিলাম আমার পাশেই কে একটা লোক দুই হাঁটুর ভিতর মুখ গুঁজিয়া বসিয়া আছে। অন্ধকারে কখন সে যে পাশে আসিয়া বসিয়াছে লক্ষ্য করি নাই।

তাহার দিকে একবার দৃষ্টি দিয়াই চোখ ফিরাইয়া লওয়া উচিত ছিল কিন্তু তাহা পারিলাম না। লোকটার বসিবার ভঙ্গি কেমন যেন অদ্ভুত। আমার মত নদীর শোভা দেখিতে সে যে আসে নাই, এটুকু তাহাকে একবার দেখিলেই বোঝা যায়।

তাছাড়া সার্চ্চ-লাইটের আলোকে তাহার পোষাক দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম আর কিছু না হোক নদীর শোভায় তাহার অরুচি ধরিবারই কথা।

তাহার গায়ে সাধারণ খালাসীর পরিচ্ছদ।

সার্চ্চ-লাইটের আলো খানিক পরেই সরিয়া গেল। এই তীব্র আলোকের পর মনে হইল অন্ধকার যেন হঠাৎ আমাদের চারিধারে গাঢ়তর হইয়া আসিয়াছে। তাহারই মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে দেখিলাম লোকটা পূর্ব্বের মতই দুই হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজিয়া বসিয়া আছে—এতক্ষণের ভিতর এতটুকু নড়ে নাই পর্য্যন্ত। তাহার সে ছায়া-মূর্ত্তির ভঙ্গি দেখিয়া ঝটিকাবিধ্বস্ত ভাঙ্গা গাছের কথাই মনে পড়ে।

নিজের মনেই পরক্ষণেই হাসিলাম। হয়ত সাধারণ একটা খালাসী—প্রচুর নেশা করিয়া বেসামাল হইয়া পড়িয়াছে—তাহাকে লইয়া কল্পনার অত বাড়াবাড়ির কোন প্রয়োজন নাই।

তাহার পর মনে হইল লোকটা হয়ত অসুস্থ। হঠাৎ পীড়িত হইয়া এইখানে অসহায় ভাবে বসিয়া আছে এমনও ত হইতে পারে। একটু খোঁজ লওয়া দরকার বিবেচনা করিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিতে যাইতেছি এমন সময় লোকটা সোজা হইয়া বসিল।

পকেট হইতে একটা বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইবার সময় দেশলাইএর আলোকে মুখখানা একবার দেখিতে পাইলাম। না, মাতাল বা অসুস্থ কিছুই সে নয়, বয়সও তাহার অল্প, তবু সে মুখ দেখিলে এক সঙ্গে ভীত ও বিস্মিত হইতে হয়। ভিতরে কত প্রবল ভাবে ঝড় বহিলে মানুষের মুখ অমন হইতে পারে তাহা আমার সত্যই জানা নাই।

একজন সাধারণ খালাসীর জীবনে ঘটনার কি এমন ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিলাম এমন সময় জেটির অপর প্রান্ত হইতে কে ডাকিল,—'মালেক'।

আমার পাশের খালাসী সে ডাকে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে বুঝিতে পারিলাম। যে ডাকিতেছিল—জেটির অপর দিক হইতে সে এবার আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর চট্টগ্রামের ভাষায় সে যাহা বলিল তাহার সমস্ত কথা ভাল করিয়া না বুঝিলেও মোটামুটি অর্থটা ধরিতে পারিলাম।

বুঝিলাম মালেকের জাহাজ আর মাত্র তিন ঘণ্টা বাদে ছাড়িবে; তথাপি মালেক পলাইয়া আসিয়া এই জেটিতে বসিয়া আছে বলিয়া তাহার সঙ্গী ভৎর্সনা করিতেছে।

সঙ্গীর ভৎর্সনায়ও মালেকের চৈতন্য হইল বলিয়া মনে হইল না। সে যেমন চুপ করিয়া বসিয়াছিল তেমনিই রহিল। এবার তাহার সঙ্গী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"তাহলে যাবিনি বল; তা না যাস্ বয়ে

গেল। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলে আর কে কি করতে পারে! তোকে খুঁজতে এসে মিছিমিছি হয়রাণ হলাম; আমারই ঝকমারী।"

মালেকের কাছ হইতে এবারও কোন উত্তর পাওয়া গেল না। তাহার সঙ্গী এবার শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, "তুই কিছু একাই দুনিয়ায় বিয়ে করিস নি, বৌ ছেলে সবার আছে। তা বলে কাজ ফেলে আবার গরীব মানুষ কে কোথায় ঘরে বসে থাকে! আর ঘরে বসে খাবি কি শুনি?"

এতক্ষণ নিঃশব্দে ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলাম, এবার কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলাম না। শুধু তাহাদের কথায় যোগ দিবার জন্যই বলিলাম—"তোমরা এক জাহাজেই কাজ কর বুঝি?"

মালেকের সঙ্গী এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই। আবার প্রশ্নে চমকিত হইয়া খানিকটা আমাকে ভাল করিয়া অন্ধকারে নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল "হ্যাঁ বাবু!" তারপর কি ভাবিয়া আমাকেই সাক্ষী মানিয়া যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই, যে স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া যাইতে সবারই কষ্ট হয়, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের মত গরীব খালাসীরা ত আর ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে না। সে যে নিজে আজ দুই বছর ঘরে যাইতে পায় নাই। সেখানে তার বৃদ্ধা মাতা, শিশু পুত্র কন্যা ও স্ত্রী আছে। দুঃখ তাহারও হয়, কিন্তু ঘরে বসিয়া থাকিলে খাইবে কি?

তাহার কথা শুনিতে শুনিতে এই ভবঘুরে খালাসীদের জীবনের নিষ্ফলতার কথা ভাবিয়া অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলাম। পৃথিবীর আর সকলের মত ইহারাও প্রিয়জনকে স্নেহবেষ্টনে বাঁধিয়া সংসার করিতে চায়, বুঝি বেশী করিয়াই চায়। অস্থির চঞ্চল জলের উপর

কোন শ্রদ্ধা, তাহার সম্বন্ধে কোন মোহ ইহাদের আর নাই। ভবঘুরের মত দেশ হইতে দেশান্তরে একান্ত অনিচ্ছায় ভাসিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ইহাদের ধ্রুব স্থির মাটির উপর যে অনুরাগ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা অস্বাভাবিক। অথচ ইহাদেরই কাছে সংসার ক্ষণিকের সুখ-স্বপ্ন মাত্র। আজীবন যে তৃষা লইয়া তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায় দুদণ্ডের বেশী তাহা মিটাইবার তাহাদের অবসর নাই।

মালেকের সঙ্গী কখন আপন মনে চুপ করিয়াছে জানিতে পারি নাই। হঠাৎ সচেতন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "এর বিয়ে বুঝি সম্প্রতি হয়েছে?"

"না বাবু! সেও ত পাঁচ বছর হ'তে চলল।"

পাঁচ বছর এমন কিছু দীর্ঘ কাল নয় তবু মালেকের এমন ভাবে স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া যাইবার কথায় ভাঙ্গিয়া পড়া এবার একটু অস্বাভাবিক মনে হইল। ভাঙ্গিয়া সে যে পড়িয়াছে এবং কতখানি যে পড়িয়াছে, আমি নিজের চোখেই কিছুক্ষণ আগে দেখিয়াছি। কিন্তু শুধু প্রিয়জনের বিরহ তাহার কারণ বলিয়া মনে করিতে পারিল না।

মালেকের সঙ্গি এবার বলিল, "তোমার জন্যে আমার নিজের কাজটি আমি খোয়াতে পারব না বাপু। যেতে হয় এখন আমার সঙ্গে চল।"

এতক্ষণ বাদে মালেকের গলার স্বর শোনা গেল,—যেন বুকের গভীরতম প্রদেশ হইতে সে স্বর বাহির হইয়া আসিয়াছে। 'চল, যাচ্ছি।' বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পরক্ষণেই তাহার কোল হইতে যে জিনিষটি অন্ধকারের মধ্যেও একবার ঝলসাইয়া উঠিয়া ঝনাৎ করিয়া কাঠের পাটার উপর পড়িয়া গেল, তাহা দেখিয়া আমি ও মালেকের সঙ্গি উভয়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

মালেকের সঙ্গী অস্ফুটস্বরে বলিল, "ওকি ?"

মালেকও প্রথমটা বোধ হয় বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ছুরিকাটি তুলিয়া সে বলিল—ও কিছু নয়! চল!"

তাহারা চলিয়া যাইবার পর কতক্ষণ বসিয়াছিলাম মনে নাই। যখন উঠিলাম তখন রাত অনেক হইয়াছে।

তখনও নদীর দেখিবার মত রূপ হয়ত ছিল, কিন্তু আমার প্রবৃত্তি ছিল না। মানুষের মনের অন্ধকার, দুর্ব্বোধ, জটিল রহস্য-লোকের এতটুকু আভাস পাইয়া তখন আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি।

বাড়ী ফিরিয়াও সেদিন কোন কাজ হল না। শুইয়া পড়িলাম, কিন্তু বুঝিলাম ঘুমের আশা নাই।

জেটির উপরকার সেই অপরিচিত খালাসীর একান্ত হতাশভাবে বসিয়া থাকিবার ভঙ্গি, দেশলাইএর আলোয় তাহার সেই ঝটিকা-বিধ্বস্ত প্রান্তরের মত মুখের রূপ, ও সব শেষে তাহার ছুরিকার সেই হিংস্র ঝলসানি আমার চোখের উপর কেবলই ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমার মনের কাছে এই বিচ্ছিন্ন দৃশ্যগুলির কি যেন দাবী আছে। তাহাদের সমন্বয় করিয়া একটা কিছু অর্থ না বাহির করিয়া দিলে আমার পীড়িত মনের যেন নিস্তার নাই।

কিন্তু কি সে অর্থ?

দীর্ঘরাত্রি অনিদ্রায় কাটাইবার পর আধ ঘুম আধ জাগরণের ভিতর কখন যেন পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছি মনে হইল।

অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ নোংরা পথ। দুধারের খাপরায় ছাওয়া মাটির ঘরগুলি যেন যুক্তি করিয়া তাহাকে দুই দিক হইতে চাপিয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে। পথে আলো নাই বলিলেই চলে।

কিন্তু সেই আবছায়া অন্ধকারেই দেখিতে পাইলাম কে একটা লোক সর্ব্বাঙ্গ মুড়িয়া দিয়া হিংস্র শ্বাপদের মত নিঃশব্দ গতিতে অতি সন্তর্পণে রাস্তার এক ধার ঘেঁসিয়া অগ্রসর হইতেছে। সেই স্বল্পালোকেও তাহার মুখ দেখিয়া চিনিতে বিলম্ব হইল না।

এ কি, এ যে মালেক! সত্যই জাহাজে তাহা হইলে সে যায় নাই। কিন্তু এত রাত্রে অমন করিয়া সে চলিয়াছে কোথায়? তাহাকে না জানিতে দিবার জন্য একটি খোলার ঘরের দরজার পাশে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া পড়িলাম। মালেক নিজের মনে তন্ময় হইয়া আমার পাশ দিয়া চলিয়া যাইবার পর তাহার অনুসরণ করিব ভাবিতেছি, এমন সময় আমারই কাছে আসিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল।

অন্ধকারে তাহার কাপড়ে ঢাকা মুখ দেখিতে পাইলাম না, তথাপি কি যেন একটা অজ্ঞাত ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল।

কিন্তু মালেক আমাকে দেখিতে পায় নাই বুঝিলাম। দরজার আর একটু কাছে আগাইয়া আসিয়া সে দুইবার করাঘাত করিল। পরমুহূর্ত্তেই দরজা খুলিয়া গেল। মালেক তখন দরজার অপর পার্শ্বে গাঢ়তর অন্ধকারে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে দরজা খুলিয়াছিল এবার তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম। সে মুখকে সুন্দর ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু পুরুষের বুকের রক্তে যুগে যুগে যাহা উন্মাদ তরঙ্গ তুলিয়াছে তাহার মুখে ছিল সেই তীব্র মাদকতা।

মালেক অস্পষ্ট স্বরে ডাকিল, 'আমিনা ?'

আমিনা আর একটু আগাইয়া আসিয়া বলিল, "হ্যাঁগো, আর কেউ নয়, আমিনা। অন্ধকারে আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভেতরে এসো না !"

তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, "আজ সন্ধ্যা বেলাতেই চলে গেছে সে, এতক্ষণ বোধ হয় মাঝ গঙ্গায়।"

"তোমার এখনও ভয় গেল না। আমি কি মিছে কথা বলছি? দেখ কাল কিন্তু আর একটু হলেই সর্ব্বনাশ হয়ে যেত। কে জানে যে অতরাত্রে ঘুমোবার ভাণ করে শুয়ে আছে। দরজায় তোমার শব্দ শুনে উঠতে যাচ্ছি, হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে পড়ে বল্লে, "দরজায় কিসের আওয়াজ হল না?" আমার ত ভয়ে রক্ত শুকিয়ে গেছে। কি ভাগ্যি দরজাটা তখনি খোলেনি। তারপর কি কষ্ট ক'রে যে শান্ত করেছি সে আমিই জানি।"

একটু থামিয়া আমিনা অন্ধকারে মালেকের একটা হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, 'আমি যা ব'লেছিলাম, এনেছ?"

তীক্ষ্ণ স্বরে মালেক বলিল "হ্যাঁ, এই যে!"

বিদ্যুৎ-চমকের মত আমিনার বুকের উপরে মুহূর্ত্তের জন্য মালেকের ছুরিকা ঝলসাইয়া উঠিল। তাহার পর সে কি তীক্ষ্ণ তীব্র মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ·········

আমিও চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখিলাম দারুণ আতঙ্কে ঘামে আমার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে।

সেই অবস্থাতেও মনে হইল জেটির উপরকার সেই বিচ্ছিন্ন দৃশ্যগুলির যোগসূত্র যেন এতক্ষণে মিলিয়াছে।

ভুল ভাঙ্গিল তাহার পরের দিনই। সকালের খবরের কাগজ-খানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া রাখিয়া দিতে যাইতেছি, এমন সময় এক কোণের একটি সংবাদে দৃষ্টি পড়ায় চমকাইয়া উঠিলাম।

সংবাদপত্রের পক্ষে সাধারণ একটি খবর মাত্র। এ খবরের জন্য কাগজের এক কোণে দুই লাইনের বেশী ব্যয় করা কেহ প্রয়োজন বোধ করে নাই, কিন্তু আমার কাছে তাহারই মূল্য অসীম।

কাগজে লিখিয়াছে, কাল কোন সমুদ্রগামী জাহাজের এক খালাসী মাঝরাত্রে হঠাৎ নিজের বুকে ছুরি বসাইয়া জাহাজ হইতে জলে ঝাপাইয়া পড়ে। আজ সকালে তাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

এই আত্মঘাতী খালাসীকেই যে আমি জেটির উপর দেখিয়াছিলাম, এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ রহিল না। তাহার সম্বন্ধে এই শেষ সংবাদটুকু জানিয়াই নিবৃত্ত হওয়া বোধ হয় উচিত ছিল, কিন্তু তাহা হইতে পারিলাম না।

মনে পড়িল 'সিমেন্‌স্‌ এসোসিয়েশনে'র সেক্রেটারীর সহিত আমার আলাপ আছে। হয়ত বিস্তারিত বিবরণ তাঁহার কাছে পাওয়া যাইতে পারে ভাবিয়া হঠাৎ দুপুর বেলা কাজকর্ম্ম ফেলিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলাম।

ভদ্রলোক আমার আকস্মিক আবির্ভাবের কারণ শুনিয়া বোধ হয় একটু বিস্মিত হইলেন। কিন্তু আমার অনুমান ভুল হয় নাই। মালেকের ব্যাপার সত্যই তিনি জানেন।

তাঁহার কাছে মালেকের জীবনের শোচনীয় পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে যে কাহিনী শুনিলাম তাহা যেমন করুণ, তেমনই পুরাতন ও একঘেয়ে।

পৃথিবীর হতভাগ্যদের জীবনের সেই চিরন্তন ছক্ ধরিয়াই সে কাহিনী চলিয়াছে।

সেই দারিদ্র্য, সেই বেকার অবস্থা, সেই দেনার পর দেনা, কাজ জোটাইবার নিষ্ফল প্রাণপণ চেষ্টা এবং সবার শেষে স্ত্রীর রোগ-শয্যা। 'সিমেন্স্ এসোসিয়েশান' হইতে সামান্য কিছু সাহায্য যে মালেক পায় নাই এমন নয়, কিন্তু তাহাতে তাহার চলিবে কেন? পাগল হইয়া মালেক টাকার চেষ্টায় ফিরিয়াছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধারও তাহাকে কেহ দিতে চায় নাই। এদিকে স্ত্রীর রোগ ক্রমশঃই বাড়িয়াছে, পাওনাদারেরা জীবন তাহার অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে।

তাহার ভাগ্যের পরিহাসে স্ত্রীর রোগশয্যা যেদিন মৃত্যুশয্যা হইয়া উঠিল, জাহাজে মালেকের কাজ মিলিল ঠিক সেই দিনই। জাহাজের কাজ। দুইদিন বিলম্ব করিবার উপায় নাই। জাহাজ ত আর খালাসীর স্ত্রীর মৃত্যু-শয্যার খাতিরে অপেক্ষা করিবে না। মালেক জানিত এ কাজ ছাড়িয়া দিলে আর কোন দিন কাজ যে মিলিবে সে ভরসা অত্যন্ত অল্প। শুধু তাই নয় এ কাজ লইলে সেই কাজের খাতিরে আরো কিছু ধার হয়ত সে করিয়া স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য রাখিয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে কি লাভ? আর চিকিৎসা বৃথা বলিয়া ডাক্তার সকালেই জবাব দিয়া গিয়াছে। স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া মালেকও যে সে কথা বোঝে নাই এমন নয়।

তবু শেষ পর্য্যন্ত মালেককে যাইতেই হইল। কাজ না লইলে ধার পর্য্যন্ত কোথাও আর মিলিবে না, ঘরে বসিয়া মুমূর্ষু স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে লইয়া সে করিবে কি?

ফতিমার শয্যালগ্ন শীর্ণ দেহের দিকে চাহিয়া তাহার চোখে বুঝি জলই আসিয়াছিল। ফতিমা দেখিতে হয়ত পায় নাই, তবুও সেই

শুভ বিবর্ণ মুখে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া ধীরে ধীরে বলিয়াছিল,—"তোমার ভয় নেই, কাল থেকে ছ'মাস বাদে ফিরে এসে দেখবে, ঠিক আমি বেঁচে আছি।"

ছয় দিন যাহার বাঁচিবার আশা নাই, জীবনে আর যাহার সহিত দেখা হইবে না, তাহার মুখে একথা আর মালেক সহ করিতে পারে নাই·········

*　　　*　　　*

কিন্তু আবার আমি ভুল করিয়া মালেকের অভিশপ্ত জীবনে বৃথাই রঙ ফলাইতে বসিয়াছি। বিধাতার রচিত ট্র্যাজিডি, রঙের ধার ধারে না। সে ট্র্যাজিডির ভীষণতা তার চিরন্তন একরঙা একঘেয়েমীতে।

পরিশিষ্ট—ক

প্রগতি লেখক সঙ্ঘের ইস্তাহার

কিছুকাল হ'তে ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়েছে। প্রগতির পথ যারা এতদিন আটকে বসেছিল তারা যদিও আজ মৃতপ্রায়, তবু তাদের জীবনের মেয়াদ বাড়াবার মরিয়া চেষ্টা চলেছে। সনাতনী সংস্কৃতিতে ভাঙ্গন ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যে আটপৌরে জীবনের বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়ার আত্মঘাতী প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আমাদের নূতন সাহিত্য প্রত্যক্ষ ও প্রাকৃতিককে ছেড়ে অপ্রত্যক্ষ ও আধ্যাত্মিকের দিকে ধাবিত হয়েছে, পৃথিবীর মাটী পরিত্যাগ করে কল্পলোকের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ফলে তার রচনাভঙ্গী অন্ধ নিয়মানুগত্যের বিষম জালে জড়িয়ে পড়েছে, তার ভাবসম্পদ হয়েছে রিক্ত ও বিকারগ্রস্ত।

আমাদের সমাজ যে নবরূপ ধারণ করছে তাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করে প্রগতিকামী মননধারাকে বেগবান করা, এই আমাদের লেখকদের কর্ত্তব্য। তাঁদের উচিত সাহিত্যবিচারক্ষেত্রে এমন দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করা যা পারিবারিক, যৌন, ধর্ম্মচিন্তাগত, যুদ্ধবিগ্রহাদি সমস্ত সাহিত্যপ্রসঙ্গ থেকে প্রগতিবিমুখ ও পশ্চাদ্গামী

মনোবৃত্তিকে উন্মূলিত করবে, এবং সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষ, যৌন স্বৈরাচার, সামাজিক অবিচারের যে ছায়া সাহিত্যে পড়েছে তার অপসারণের জন্য তাঁদের সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

যে পরিবর্ত্তনবিদ্বেষী শ্রেণীর হাতে বহুকাল যাবৎ সাহিত্য ও অন্যান্য কলার অপগতি ঘটেছে, তাদের কবল হ'তে সাহিত্যকে উদ্ধার করা আমাদের সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। আমরা চাই জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সর্ব্ববিধ কলার নিবিড় সংযোগ; আমরা চাই যে সাহিত্য প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলুক, আর যে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা আমরা করছি তাকে এগিয়ে আনুক।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ, আমরা তার উত্তরাধিকারের দাবী করি। আমাদের দেশে নানারূপে যে প্রগতিদ্রোহ আজ মাথা তুলেছে তাকে আমরা সহ্য করব না। ভারতীয় ও বিদেশী উৎস হ'তে ভাষান্তর সংগ্রহ ও মৌলিক সাহিত্য-সৃষ্টি দিয়ে যা কিছু আমাদের দেশকে নবজীবনের পথে এগিয়ে দেবে তার প্রোৎসাহন আমাদের কাজ হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষের নবীন সাহিত্যকে আমাদের বর্ত্তমান জীবনের মূল সমস্যা—ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক পরাঙ্মুখতা, রাজনৈতিক পরাধীনতা—নিয়ে আলোচনা করতেই হবে। যা কিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্ম্মণ্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে, তাকে আমরা প্রগতিবিরোধ বলে প্রত্যাখ্যান করি। যা কিছু আমাদের বিচারবুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে, সমাজব্যবস্থা ও রীতিনীতিকে যুক্তিসম্মত-ভাবে পরীক্ষা করে, আমাদের কর্ম্মিষ্ঠ, শৃঙ্খলাপটু, সমাজের রূপান্তর-ক্ষম করে, তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করবো।

আমাদের সঙ্ঘের লক্ষ্য ঃ—

(১) ভারতবর্ষের নানা ভাষাকেন্দ্রে সঙ্ঘের শাখা বিস্তার, সম্মেলন আহ্বান ও পুস্তিকাদি প্রকাশ করে বিভিন্ন শাখার সুব্যবস্থিতি, প্রাদেশিক শাখা ও কেন্দ্রীয় সঙ্ঘের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন ও যে সমস্ত সাহিত্য-সভার সঙ্গে আমাদের উদ্দেশ্যগত বিরোধ নেই তাদের সঙ্গে সহযোগিতা।

(২) ভারতবর্ষের প্রতি বিশিষ্ট নগরে শাখা স্থাপন।

(৩) প্রগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টি ও অনুরূপ বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ।

(৪) প্রগতিশীল লেখকদের স্বার্থ সংরক্ষণ।

(৫) চিন্তা ও মতবাদের অবাধ প্রকাশের অধিকার প্রচার।

* * *

বাংলায় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের বর্ত্তমান সভাপতি হচ্ছেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, কোষাধ্যক্ষ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। যাঁরা সঙ্ঘের সভ্য হতে চান্, তাঁরা যেন দয়া করে বঙ্গবাসী কলেজের ঠিকানায় সম্পাদককে পত্র লেখেন। সঙ্ঘের বার্ষিক চাঁদা একটাকা মাত্র। বাংলার ও আসামের কয়েকটী জেলায় সঙ্ঘের শাখা স্থাপিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট—খ

বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে ভারতীয় মনীষীদের বাণী

* গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক পুস্তক ও পত্রিকাদি নিষিদ্ধ করা এবং আর এক মহাযুদ্ধের আয়োজনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভারতের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নিম্নলিখিত ইস্তাহার প্রচার করিতেছেন। রোমঁ্যা রোলাঁর আহ্বানে ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ তারিখে ব্রুসেলসে যে বিশ্বশান্তি সম্মেলন হইয়াছে ইস্তাহারটি তথায় প্রেরিত হইয়াছে। প্যারিসে সংস্কৃতি রক্ষা সম্মেলনেও উহা প্রেরিত হইয়াছে। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের লেখক, শিল্পী ও মনীষীরা এই ইস্তাহারে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের উদ্যোগেই এই প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। *

দেশে এবং বিদেশে সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহা অত্যন্ত আশঙ্কা ও উদ্বেগজনক। উন্মত্ত প্রতিক্রিয়া এবং জঙ্গিবাদ আজ সভ্যতার ভাগ্য লইয়া খেলা করিতেছে এবং সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিবার উপক্রম করিয়াছে। সুতরাং আমরা ইহার বিরুদ্ধে ভারতের লেখক ও শিল্পিগণের, এবং সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতি যাঁহাদের দরদ আছে তাঁহাদের সকলের প্রতিনিধিরূপে প্রতিবাদ জানান অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। এ সময়ে আমাদের নীরব থাকা অপরাধ হইবে, সমাজের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য তাহার ঘোর ব্যত্যয় করা হইবে।

ভারতে নাগরিক অধিকার হইতে জনগণকে যেরূপ সাঙ্ঘাতিক ভাবে বঞ্চিত করা হইতেছে, তাহা শুধু রাজনীতির দিক দিয়াই সর্ব্বনাশকর নহে, উহা দ্বারা সংস্কৃতি ও জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতি

বিস্তারের চেষ্টাকে খোলাখুলি আক্রমণ করা হইতেছে। প্রায়শই যে ভাবে পুস্তকাদি, বিশেষতঃ সমাজতন্ত্রের মতবাদ ও কার্য্যপদ্ধতি সংক্রান্ত পুস্তক বাজেয়াপ্ত করা হইতেছে, তাহা আমাদের মতে অত্যন্ত কলঙ্ককর। নামজাদা বাণিজ্য শুল্ক আইনের (Sea Customs Act) ১৯ ধারা অনুসারে বিদেশ হইতে প্রেরিত পুস্তক, পুস্তিকা ও পত্রিকা আটক করার কথা প্রায়ই শুনি। শ্রেষ্ঠ সমাজতত্ত্ববিদ হিসাবে সিডনী ও বিয়াট্রিস ওয়েবের প্রচুর খ্যাতি আছে; কিন্তু তাঁহাদের সে খ্যাতি সত্ত্বেও তাঁহাদের লেখা "সোভিয়েট কমিউনিজম" নামক পুস্তক পর্য্যন্ত ঐ আইনে ভারতে আমদানী করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এমন কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রাশিয়ার চিঠি"র ইংরাজী অনুবাদ নিষিদ্ধ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃতি ও প্রগতি বিরোধী মনোভাব ছাড়া ইহার আর কোন কারণ থাকিতে পারে না। বোম্বাইতে সম্প্রতি লো'র "রাশিয়ান স্কেচ বুক" বাজেয়াপ্ত হয়; ব্যাপারটি অত্যন্ত বিস্ময়কর হইলেও উহা হইতে সেন্সর নীতির কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাজেয়াপ্ত বা কাষ্টমস্ কর্তৃপক্ষের আদেশে নিষিদ্ধ পুস্তক ও পত্রিকার তালিকা প্রকাশ করিলেই বোঝা যাইবে, এ দেশে সরকারী কার্য্যপদ্ধতি কিরূপ নিন্দার্হ। ইহা ছাড়া, দেশে স্বাধীন ও শক্তিশালী সংবাদপত্র সৃষ্টির বিরুদ্ধে অবিরাম আক্রমণ তো আছেই।

সরকারী হিসাব অনুসারে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ৩৪৮ খানি সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের জামীনের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। চিন্তার ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা আমরা ভোগ করি বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহার দুরবস্থা সকলের পক্ষে উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে।

সংস্কৃতির প্রতি যাহাদের দরদ আছে তাহাদের কাছে ভারত অপেক্ষাও ভারতের বাহিরের অবস্থা আরও উদ্বেগজনক। মহাযুদ্ধের প্রেতছায়া পৃথিবীময় বিচরণ করিতেছে। ফ্যাশিষ্ট ডিক্টেটরী খাদ্যের পরিবর্ত্তে অস্ত্র যোগাইয়া এবং সংস্কৃতির সুযোগের পরিবর্ত্তে সাম্রাজ্য গঠনের প্রলোভন ধরিয়া নিজের জঙ্গিবাদী রূপ উদ্ঘাটন করিয়াছে। আবিসিনিয়াকে পদানত করিবার জন্য ইতালী যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহা যুক্তি ও সভ্যতার প্রতি বিশ্বাসবান্ সকলকে কঠিন আঘাত করিয়াছে। বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধিতা, স্থূল জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তিকে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্ররোচনা দান, দ্রুত অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধি, সঙ্কটময় পরিস্থিতির এই সব পূর্ব্বসূচনা। আমরা এই সুযোগে আমাদের এবং আমাদের দেশবাসীর পক্ষ হইতে অন্যান্য দেশের জনসাধারণের সহিত সমস্বরে বলিতেছি যে, আমরা যুদ্ধকে ঘৃণা করি এবং যুদ্ধ পরিহার করিতে চাই; যুদ্ধে আমাদের কোন স্বার্থ নাই। কোন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতবর্ষের যোগদানের আমরা ঘোর বিরোধী; কারণ আমরা জানি যে, আগামী যুদ্ধে সভ্যতা ধ্বংস হইবে। সোভিয়েট ইউনিয়নই হউক, বা নাৎসী জার্ম্মাণীই হউক—যেখানে সংস্কৃতি বিপন্ন হইবে সেখানেই উহার রক্ষার জন্য আমরা উদগ্রীব এবং আমাদের মহৎ উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য আমরা যথাশক্তি সংগ্রাম করিব।

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী,
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রেমচাঁদ,
জওহরলাল নেহরু, প্রভৃতি। ১৪ই ভাদ্র, ১৩৪৩